৩

পরিমাপ ও মাপনী
Measurement and Scaling

গবেষণাযোগ্য সমস্যার নির্বাচন ও সূত্রবদ্ধকরণের পর গবেষণা সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়গুলোর সুস্পষ্ট সংজ্ঞায়ন করা প্রয়োজন। কারণ, কিছু কিছু প্রত্যয় রয়েছে যেগুলোকে সংজ্ঞায়িত করা সহজ এবং সেগুলোর অভিজ্ঞতালব্ধ বৈশিষ্ট্যকে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বেশী বেগ পেতে হয় না। কিন্তু কিছু প্রত্যয় রয়েছে যেগুলোর বাস্তব অস্তিত্বকে পরোক্ষভাবে অনুমান করতে হয়। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই পরোক্ষ অনুমানের কার্য সম্পাদন করা হয়, সেই প্রক্রিয়াকে পরিমাপ প্রক্রিয়া বলা হয়ে থাকে। পরিমাপের পরই কেবল একটি প্রত্যয় নির্ভরশীল বা স্বাধীন চলকের রূপ নেয়। যদি একটি চলকের একাধিক সূচক থাকে, তবে সেই সূচকগুলো চলক ও প্রত্যয়কে প্রতিনিধিত্ব করে। প্রত্যয়ের পর্যবেক্ষণযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো বিভিন্ন মাত্রা ও মাপনীতে পরিমাপ করা হয়ে থাকে। কিন্তু অভিজ্ঞতালব্ধ বৈশিষ্ট্যগুলোকে পরিমাপের সময় বিভিন্নভাবে ভ্রান্তি প্রবেশ করে বলে পরিমাপের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতার মাত্রা নিরূপণ করা প্রয়োজন। এই ইউনিটে এ সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে বিষয়বস্তুর মিল থাকার কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে "সামাজিক পরিসংখ্যান পরিচিতি" (সমাজতত্ত্ব-৪) গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক অংশের সাথে সাদৃশ্য থাকবে।

এই ইউনিটে আমরা যে পাঠগুলো অধ্যয়ন করবো, সেগুলো হলো:

- পাঠ - ১ : কার্যকর সংজ্ঞায়ন ও পরিমাপ
- পাঠ - ২ : পরিমাপের মাত্রা - ১: ব্যাপ্তিমূলক ও অনুপাতমূলক
- পাঠ - ৩ : পরিমাপের মাত্রা - ২ : ব্যাপ্তিমূলক ও অনুপাতমূলক
- পাঠ - ৪ : পরিমাপের নির্ভরযোগ্যতা
- পাঠ - ৫ : পরিমাপের যথার্থতা
- পাঠ - ৬ : মাপনী কৌশল

পাঠ - ১

কার্যকর সংজ্ঞায়ন ও পরিমাপ
Operationalization and Measurement

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- সংজ্ঞায়নের গুরুত্ব
- প্রত্যয়গত-তত্ত্বগত সংজ্ঞা
- কার্যকর-অভিজ্ঞতালব্ধ সংজ্ঞা
- পরিমাপ প্রক্রিয়া

সংজ্ঞায়নের গুরুত্ব (Importance of Definition)

গবেষণার উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, পদ্ধতি, উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি ও বিশ্লেষণের মাত্রা কি হবে, তা নির্ভর করে গবেষণাযোগ্য সমস্যার নির্বাচন ও এর যথাযথ সূত্রবদ্ধকরণের উপর।

ইউনিট ২-এ আমরা জেনেছি যে, যে কোন অর্থপূর্ণ গবেষণার জন্য প্রাথমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো একটি গবেষণাযোগ্য সমস্যার নির্বাচন ও এর যথাযথ সূত্রবদ্ধকরণ। কারণ, গবেষণার উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, পদ্ধতি, উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি ও বিশ্লেষণের মাত্রা কি হবে, তা নির্ভর করে গবেষণাযোগ্য সমস্যার নির্বাচন ও এর যথাযথ সূত্রবদ্ধকরণের উপর। গবেষণার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, গবেষণা সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়গুলোর সুস্পষ্ট সংজ্ঞায়ন। কারণ, প্রত্যয়গুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের চিন্তার যে যৌক্তিকতাটিকে প্রকাশ করি, তা অনেক সময় থাকে অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থক ও অযথার্থ। কিছু প্রত্যয় রয়েছে যেগুলো প্রতিনিধিত্বকারী বস্তু বা তথ্যের খুব কাছাকাছি। যেমন, 'মানুষ' প্রত্যয়টি দিয়ে একজন মানুষকে দেখানো বা বোঝানো খুব সহজ হয়। কেন না, মানুষ নামের দৃশ্যমান বস্তুটি সহজেই দেখা যায়, ছোঁয়া যায় এবং বর্ণনা করা যায়। মানুষের যে বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে এই প্রত্যয়টি গঠিত হয়েছে, তা সহজেই পর্যবেক্ষণযোগ্য। কিন্তু কিছু প্রত্যয় রয়েছে, যা খুব সহজে দেখানো সম্ভব হয়ে উঠে না। প্রেষণা, তৃপ্তি, শ্রেণীদ্বন্দ্ব, গণতন্ত্র, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, ইত্যাদি হলো এ ধরণের কিছু প্রত্যয়।

প্রত্যয় হলো এক ধরণের প্রতীক, যা ভাবের আদান প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রত্যয়গত সংজ্ঞা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। কারণ, প্রত্যয় হলো এক ধরণের প্রতীক, যা ভাবের আদান প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। গবেষণা ও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যয় উপযোগী হতে পারে, অথবা অনুপযোগী হতে পারে। প্রত্যয়ের সংজ্ঞার বোধগম্যতা বা বুদ্ধিগ্রাহ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে; অথবা এর ব্যবহারের সামঞ্জস্যতা নিয়ে সমালোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু এটি বলা যাবে না যে, প্রত্যয়গত সংজ্ঞা সত্য কি মিথ্যা।

সামাজিক বিজ্ঞানীরা তাদের নিজস্ব বিষয়বস্তুকে বিশিষ্টতা দানের লক্ষ্যে স্পষ্ট ও যথার্থ প্রত্যয় প্রতিষ্ঠার জন্য সবসময় সচেষ্ট থেকেছেন।

শুধু তাই নয়, বিভিন্ন প্রত্যয় বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন অর্থ বহন করে এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে চিহ্নিত করার কাজে এগুলোকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রত্যয়ের এই দ্ব্যর্থক, অস্পষ্ট ও অশুদ্ধ ব্যবহার প্রতিদিনের ভাবের আদান প্রদানের জন্য তেমন কোন বড় ধরণের সমস্যা তৈরি করে না। কিন্তু এ ধরণের অস্পষ্ট ও অযথাযথ ভাষা ব্যবহার করে বিজ্ঞান বিকশিত হতে পারে না। সে কারণে, প্রতিটি বিজ্ঞানই তার নিজস্ব পদাবলী নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন থাকে। সামাজিক বিজ্ঞানীরা তাদের নিজস্ব বিষয়বস্তুকে বিশিষ্টতা দানের লক্ষ্যে স্পষ্ট ও যথার্থ প্রত্যয় প্রতিষ্ঠার জন্য সবসময় সচেষ্ট থেকেছেন। এই প্রক্রিয়ায়, যদিও বহু প্রত্যয় আবিষ্কৃত হয়েছে, ব্যবহৃত হয়েছে, পরিশুদ্ধ হয়েছে এবং পরিত্যক্ত হয়েছে, কিন্তু অনেক প্রত্যয় এখনো দ্ব্যর্থক ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ রয়ে গিয়েছে। এতে অবশ্য বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ, সামাজিক বিজ্ঞানের প্রত্যয়গুলোকে সাধারণ মানুষের দ্বারা সাধারণভাবে ব্যবহৃত পদাবলী থেকে পার্থক্য নির্ণয় করা খুব সহজ কাজ নয়। কিন্তু তারপরও সামাজিক বিজ্ঞানের এবং এর পদাবলীর বিকাশ এগিয়ে চলেছে প্রত্যয়গুলোর সুস্পষ্ট ও যথাযথ সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে। প্রত্যয়ের ব্যবহারে সূক্ষ্মতা ও স্পষ্টতা অর্জন করতে হলে, একজন বিজ্ঞানীকে তার ব্যবহারের পদাবলীকে

সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। সংজ্ঞায়নের দু'টি পর্যায় রয়েছে – প্রত্যয়গত-তত্ত্বগত (conceptual-theoretical) এবং কার্যকর-অভিজ্ঞতালব্ধ (operational-empirical)। এই দু'ধরণের সংজ্ঞাকে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক।

সংজ্ঞায়নের দু'টি পর্যায় রয়েছে – প্রত্যয়গত-তত্ত্বগত এবং কার্যকর-অভিজ্ঞতালব্ধ।

প্রত্যয়গত-তত্ত্বগত সংজ্ঞা (Conceptual –Theoretical Definitions)

যে সকল সংজ্ঞা একটি প্রত্যয়কে অন্য প্রত্যয় ব্যবহারের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করে, তাকে প্রত্যয়গত-তত্ত্বগত সংজ্ঞা বলে। যেমন, 'ক্ষমতা' প্রত্যয়টিকে সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে যে, 'ক্ষমতা হলো একজন ব্যক্তি, একটি গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের অন্য ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রকে দিয়ে কোন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করিয়ে নেবার শক্তি, সামর্থ্য বা দক্ষতা। এর অনুপস্থিতিতে অন্য ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রকে দিয়ে সেই কাজটি করিয়ে নেয়া সম্ভব হতো না। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হলো যে, ক্ষমতাকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে 'শক্তি', 'সামর্থ্য', 'দক্ষতা' ও 'কর্মকান্ড'-এর মত আরো কয়েকটি প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রত্যয়গুলোর অর্থ একেক জনের কাছে একেক রকম হতে পারে। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, 'শক্তি, সামর্থ্য বা দক্ষতা বলতে কি বোঝায়'? 'শক্তি কি শারীরিক, না কি মানসিক'? 'সামর্থ্য কি অর্থনৈতিক, না কি রাজনৈতিক'? 'দক্ষতা কি বাক-চাতুর্যের, না কি কৃৎ-কৌশলগত'? ইত্যাদি। অতএব, ক্ষমতার সংজ্ঞায়নে এই প্রত্যয়গুলোকেও সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়োজন রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়েও যদি কোন প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে সেগুলোকেও সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

যে সকল সংজ্ঞা একটি প্রত্যয়কে অন্য প্রত্যয় ব্যবহারের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করে তাকে প্রত্যয়গত-তত্ত্বগত সংজ্ঞা বলে।

প্রত্যয়গত সংজ্ঞা দু'ধরণের পদ নিয়ে গঠিত হয়। একটি হলো 'আদিম পদ' এবং অন্যটি হলো 'আহরিত পদ'। সংজ্ঞায়নের প্রক্রিয়ার এক পর্যায়ে দেখা যাবে যে, প্রত্যয়কে আর অন্য কোন প্রত্যয় বা পদ দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা যাচ্ছে না। এই পদগুলোকে 'আদিম পদ' (primitive term) বলে। আদিম পদগুলোর অর্থ সম্পর্কে একটি ঐকমত্য থাকে। সাধারণতঃ, তাদের অর্থকে উদাহরণের মাধ্যমে জ্ঞাপন করা হয়। এগুলো ভাষার মৌলিক পদাবলী বিকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়। আহরিত পদ হলো সে সকল পদ, যা আদিম পদ ব্যবহারের মাধ্যমে গঠিত হয়। অতএব, যদি 'ব্যক্তি', 'দুই বা ততোধিক', 'নিয়মিত', ইত্যাদির মত আদিম পদগুলো সম্পর্কে আমরা একমত হতে পারি, তবে গোষ্ঠীর মত একটি আহরিত পদকে সংজ্ঞায়িত করা যায়। আহরিত পদগুলোর প্রধান সুবিধা হলো, তাদের ব্যবহার অধিকতর কার্যকর হয়ে থাকে এবং এগুলোর সংজ্ঞায়নে আদিম পদের তুলনায় কম প্রয়াস প্রয়োগ করতে হয়। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করা যাক। যেমন, একটি ত্রিভুজ হলো তিনটি সরল রেখার যোগফল এবং সরল রেখা হলো কতগুলো বিন্দুর যোগফল। কিন্তু বিন্দুকে আর কোন পদ বা প্রত্যয় দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা যায় না, কেবলমাত্র বিন্দুর অস্তিত্ব বর্ণনা করা যায়। এই 'বিন্দু' পদটি হলো 'আদিম' পদ এবং 'সরল রেখা' হলো 'আহরিত পদ' (derived term)। আরও একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন, সমাজকে সংজ্ঞায়িত করা যায় সামাজিক গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত একটি একক হিসেবে। আবার সামাজিক গোষ্ঠী হলো, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির নিয়মিত পারস্পরিক মিথষ্ক্রীয়ার মাধ্যমে গঠিত একটি জনসমষ্টি। এ ক্ষেত্রে, ব্যক্তি হলো 'আদিম পদ' এবং সামাজিক গোষ্ঠী হলো 'আহরিত পদ'।

যে সকল প্রত্যয়গত সংজ্ঞা ভাবের আদান প্রদান বা যোগাযোগ প্রতিষ্ঠাকে শক্তিশালী করে তোলে, সে সকল সংজ্ঞাকে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হয়। *প্রথমতঃ*, যে প্রত্যয়কে সংজ্ঞায়িত করা হয়, একটি সংজ্ঞাকে সেই প্রত্যয়ের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীকে চিহ্নিত করতে হবে। *দ্বিতীয়তঃ*, একটি সংজ্ঞা কোনভাবেই বৃত্তাকারে পরিভ্রাম্যমান (circular) হতে পারবে না। অর্থাৎ, এটির সংজ্ঞায়নে এমন কোন পদ ব্যবহার করা যাবে না, যা ঐ পদটিকেই সংজ্ঞায়িত করে। যেমন, ক্ষমতার সংজ্ঞায়নে বলা যাবে না যে, ক্ষমতা হলো এমন একটি গুণ, যা একমাত্র ক্ষমতাবান মানুষেরই রয়েছে। এ ধরণের সংজ্ঞা যোগাযোগকে শক্তিশালী করে না। *তৃতীয়তঃ*, একটি সংজ্ঞাকে ধনাত্মকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। যেমন, বুদ্ধিমত্তাকে যদি এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে, এটি হলো মানুষের এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যার কোন রঙ, রূপ, ওজন বা স্বাদ নেই, তবে সেই সংজ্ঞা বুদ্ধিমত্তাকে বুঝতে সাহায্য করে না। কারণ, পৃথিবীতে এমন অনেক বিষয় বা বস্তু রয়েছে যেগুলোর রঙ, রূপ বা স্বাদ নেই। *চতুর্থতঃ*, একটি সংজ্ঞাকে বর্ণনার ক্ষেত্রে সবসময় স্পষ্ট পদাবলী ব্যবহার করতে হবে। যেমন,

যে সকল প্রত্যয়গত সংজ্ঞা ভাবের আদান প্রদান বা যোগাযোগ প্রতিষ্ঠাকে শক্তিশালী করে তোলে সে সকল সংজ্ঞাকে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হয়।

বিচ্ছিন্নতাবোধের অর্থ বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন রকম। অতএব, এরকম দ্ব্যর্থক শব্দ বা পদ সংজ্ঞায় ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

কার্যকর-অভিজ্ঞতালব্ধ সংজ্ঞা (Operational – Empirical Definitions)

কার্যকর সংজ্ঞা প্রত্যয়ের অর্থকে আমাদের অভিজ্ঞতার আওতায় আনতে গিয়ে কি করতে হবে এবং কি পর্যবেক্ষণ করতে হবে, তা বলে দেয়।

আমরা জানি যে, প্রত্যয়কে প্রতিনিধিত্ব করে এমন অভিজ্ঞতালব্ধ বৈশিষ্ট্য বা ঘটনা প্রায়শঃ প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না। মূল্যবোধ, বুদ্ধিমত্ত্বা, সন্তুষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গি, ইত্যাদি হলো এমন কিছু প্রত্যয়। এ সব ক্ষেত্রে, একটি প্রত্যয়ের বাস্তব অস্তিত্বকে পরোক্ষভাবে কার্যকর বা অভিজ্ঞতালব্ধ সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে অনুমান (infer) করতে হয়। একটি প্রপঞ্চের বাস্তবসম্মত অস্তিত্ব বা অস্তিত্বের মাত্রা প্রদর্শনের জন্য যে সকল প্রয়োজনীয় কর্মকান্ড সম্পাদন করতে হয়, কার্যকর সংজ্ঞা সেই সকল কর্মকান্ডের নিয়মাবলীকে নির্দেশ করে। কার্যকর সংজ্ঞা প্রত্যয়ের অর্থকে অনুভবযোগ্য করে তোলে। কার্যকর সংজ্ঞা প্রত্যয়ের অর্থকে আমাদের অভিজ্ঞতার আওতায় আনতে গিয়ে কি করতে হবে এবং কি পর্যবেক্ষণ করতে হবে তা বলে দেয়। যেমন, জন্মশীলতা (fertility) একটি প্রত্যয়। জন্মশীলতা প্রত্যয়টিকে বাস্তবে কিভাবে পরিমাপ করা যায়, কার্যকর সংজ্ঞা আমাদের তা বলে দেবে। অর্থাৎ, একজন নারী তার পুরো প্রজনন বয়সে মোট কতটি সন্তান জন্ম দেবেন, তার সংখ্যা নির্ণয় করার পদ্ধতিটি কার্যকর সংজ্ঞা বর্ণনা করে থাকে। এই বর্ণনার মাধ্যমে জন্মশীলতা প্রত্যয়টি বাস্তবে পর্যবেক্ষণযোগ্য হয়ে উঠে। আরও একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন, একজন ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতাকে পরিমাপ করতে হলে, সেই ব্যক্তি কত বছর আনুষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়া করেছেন, তা জানতে চাওয়ার মাধ্যমে কার্যকর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন প্রত্যয়ের কার্যকর সংজ্ঞার মাত্রা বিভিন্ন হয়ে থাকে এবং সেই ভিন্নতার মাত্রাটি নির্ভর করে, প্রত্যয়টি কতটুকু বিমূর্ত তার উপর।

কার্যকর সংজ্ঞার কাঠামোটি খুব সহজবোধ্য এবং সহজসাধ্য। যদি কোন বস্তুর উপর একটি উদ্দীপক প্রয়োগের পর দেখা যায় যে, সেই বস্তুটি নিয়মিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে, তবে বলা যায় যে, সেই বস্তুটির প্রতিক্রিয়ায় প্রদর্শিত বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে। এভাবেই কার্যকর সংজ্ঞার কাঠামোটি তৈরি হয়। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ধরা যাক, বুদ্ধিমত্তাকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের উপর একটি বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা প্রয়োগ করার পর যে পরীক্ষা মানটি পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে বুদ্ধিমত্তাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এখানে বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষাটি হলো উদ্দীপক, পরীক্ষা মানটি হলো প্রতিক্রিয়া, এবং বুদ্ধিমত্তা হলো বৈশিষ্ট্য। সামাজিক বিজ্ঞানীদের দ্বারা ব্যবহৃত বহু প্রত্যয়কে কার্যকরভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দীপক, অবস্থা, শর্ত বা পরিস্থিতির প্রতি প্রতিক্রিয়ার মাত্রার উপর ভিত্তি করে। কারণ, ব্যক্তি বা ঘটনার উপর ভৌত পরীক্ষণ, হয় বাস্তবসম্মত হবে না, নতুবা নৈতিকতাসম্মত হবে না।

এবার একটি উচ্চ মাত্রার বিমূর্ত ও জটিল প্রত্যয়ের উদাহরণ দিয়ে দেখা যেতে পারে যে, অভিজ্ঞালব্ধ গবেষণার ক্ষেত্রে সেটিকে কিভাবে কার্যকর সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানে 'বিচ্ছিন্নতাবোধ' একটি পরিচিত প্রত্যয়। এই প্রত্যয়টিকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে, এটির বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা বিভিন্ন প্রত্যয়গত সংজ্ঞাকে নির্দেশ করে। যেমন, *প্রথমতঃ*, বিচ্ছিন্নতাবোধকে ক্ষমতাহীনতার মনোভাবের সাথে অর্থবোধক করা যায়। যেমন, একজন ব্যক্তি মনে করতে পারেন যে, নিজের নিয়তির উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। অর্থাৎ, ব্যক্তি যাই করুক না কেন, ফলাফলের উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এ ধরণের মানসিকতা থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরি হয়। *দ্বিতীয়তঃ*, অর্থহীনতার সাথেও বিচ্ছিন্নতাবোধকে সমার্থক করা যায়। একজন ব্যক্তি যখন তার আশে পাশের জগৎকে বুঝতে পারেন না, বা তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বল্প মাত্রার ব্যাখ্যাও খুঁজে পান না, তখন তার মধ্যে এক ধরণের বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম হয়। *তৃতীয়তঃ*, আদর্শহীনতা বা পথভ্রষ্টতা হলো বিচ্ছিন্নতাবোধের আরেকটি মাত্রা। যখন মানুষ মনে করে যে, নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সামাজিকভাবে অপ্রত্যাশিত আচরণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তখন সে প্রচলিত নিয়ম-নীতি বিসর্জন দিয়ে দুর্নীতি বা অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে, অথবা প্রচলিত আদর্শ ও বিশ্বাসকে অস্বীকার করে সেগুলোর পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়। যেমন, বিপ- ব ও যুদ্ধ সংঘটনে এ ধরণের মানসিকতা বিশেষভাবে অবদান রাখে। অর্থাৎ,

প্রচলিত ধ্যান ধারণা, রীতিনীতি, আচার বিশ্বাসকে, তা অনানুষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক যাই হোক না কেন, অমান্য করার মধ্য দিয়ে মানুষ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। *চতুর্থতঃ*, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এক ধরণের বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরি করে। যেমন, সামাজিকভাবে যখন একজনকে বর্জন করা হয়, বা একঘরে করা হয়, বা প্রত্যাখ্যান করা হয়, তখন সেই ব্যক্তি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অথবা ব্যক্তি যখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত উচ্চ মূল্যবোধসম্পন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে নিম্ন মাত্রায় ভাবতে শুরু করে, তখনও এক ধরণের বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম নেয়। যেমন, লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষাকে সমাজে উচ্চতর গুরুত্ব দেয়া হয়, অথচ ব্যক্তি মনে করতে পারেন যে, জীবনে এই শিক্ষার কোন মূল্য নেই। কেন না, প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনে তা কোনভাবেই সাহায্য করে না। *পঞ্চমতঃ*, আত্ম-বিচ্ছিন্নতাও বিচ্ছিন্নতাবোধের সাথে জড়িত। মানুষ যখন মনে করে যে, কোন বিশেষ কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ তার জন্য কোন পুরস্কার বয়ে আনবে না, তখন সে সেই কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে না। ফলে, এক ধরণের বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরি হয়।

এই তাত্ত্বিক বা প্রত্যয়গত উপলব্ধির উপর নির্ভর করে গবেষক নির্ধারণ করবেন, কোন প্রসঙ্গটি তার গবেষণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সেই প্রসঙ্গটি বেছে নিয়ে তিনি তখন এর কার্যকর সংজ্ঞায়নে প্রবৃত্ত হবেন এবং তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার কাছে প্রশ্ন রাখবেন। রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাবোধের উপর গবেষণার ক্ষেত্রে ক্ষমতাহীনতাকে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে কার্যকরভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যেমন,

- সরকার একটি আইন প্রণয়নের কথা বিবেচনা করছে, যা ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষের জন্য খুব ক্ষতিকর হবে বলে আপনি মনে করেন, এ ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন?
- যদি সরকারের এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আপনি কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতেন, তবে আপনার সফল হবার সম্ভাবনা কতটুকু থাকতো?
- যদি সেই আইন পবিরর্তনের কোন উদ্যোগ কেউ গ্রহণ করেন, সে ক্ষেত্রে আপনার সেই উদ্যোগে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা কতটুকু থাকবে?
- আপনি কি কখনো কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট হবেন?

তবে, প্রশ্ন নির্মাণের পূর্বে প্রত্যয়গত সংজ্ঞাগুলোকে কার্যকরভাবে সংজ্ঞায়িত করে নিতে হবে প্রতিটি প্রত্যয়গত অর্থের সাথে অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণের সূচক নির্ণয়ের মাধ্যমে। সূচকগুলোর মাধ্যমে কিভাবে প্রত্যয়কে অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হয়, পরিমাপ প্রক্রিয়া তার পদ্ধতি নির্দেশ করে।

পরিমাপ প্রক্রিয়া (Measurement Process)

একটি প্রত্যয়কে গবেষণায় প্রয়োগ করতে হলে, এটিকে বাস্তবে পরিমাপযোগ্য করে তুলতে হবে। এটি পরিমাপ করার পরই কেবল একটি প্রত্যয় নির্ভরশীল বা স্বাধীন চলকের রূপ নেয়। এই চলকগুলো বাস্তব জগতের বিষয়গুলো ব্যাখ্যায় সহায়তা করে থাকে। এই চলকগুলোই প্রকৃতপক্ষে প্রত্যয়ের প্রতিনিধিত্ব করে এবং পরীক্ষণযোগ্য অনুকল্পের মধ্যে উপস্থাপিত হয়। কিন্তু যদি এই চলকগুলো একের অধিক সূচকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তবে সেই সূচকগুলো দিয়ে অনুকল্প গঠন করতে হয় এবং একাধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে একটি চলকের উপর উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়। যেমন, ধার্মিকতা প্রত্যয়টি পরিমাপ করতে হলে, একজন মানুষ কোন ধর্মাবলম্বি শুধুমাত্র তা জানলেই চলবে না। একজন ব্যক্তি প্রতিদিন কতটুকু সময় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ব্যয় করেন, প্রতিদিন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন কি না, সেবামূলক কাজে অর্থ ব্যয় করেন কি না, এমন বহু বিষয়ের উপর প্রশ্ন করতে হয়। একজন ব্যক্তি কতটুকু ধার্মিক তা নির্ভর করবে এ সব সূচকের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর।

বিমূর্ত প্রত্যয় পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রত্যয়কে পরিমাপ না করে সামাজিক বিজ্ঞানীরা প্রায়শঃ প্রত্যয়ের প্রতিনিধিত্বকারী সূচককে পরিমাপ করে থাকেন।

বিমূর্ত প্রত্যয় পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রত্যয়কে পরিমাপ না করে সামাজিক বিজ্ঞানীরা প্রায়শঃ প্রত্যয়ের প্রতিনিধিত্বকারী সূচককে পরিমাপ করে থাকেন। যেমন, গণতন্ত্র, প্রেষণা, এবং ক্ষমতার মত প্রত্যয়গুলো

প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না। সেগুলোকে সূচকের পরিমাপের মাধ্যমে অনুমান করতে হয়। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যদি নিয়মিতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তবে একজন অনুমান করতে পারেন যে, সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব রয়েছে। যদি একজন ব্যক্তি প্রেষণা পরীক্ষায় একটি নির্দিষ্ট মান অর্জন করেন, তবে গবেষক সেই ব্যক্তির প্রেষণার মাত্রা সম্পর্কে অনুমান করতে পারেন। এই উদাহণগুলো থেকে বোঝা যায় যে, চিহ্নিত করা যায় এমন আচরণকে একটি অন্তর্নিহিত প্রত্যয়ের সূচক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু বিমূর্ত প্রত্যয়কে প্রতিনিধিত্বশীল করার জন্য একটি সূচকের পরিবর্তে বহু সূচকের প্রয়োজন হয়। গণতন্ত্র নির্বাচনের অতিরিক্ত অন্যান্য বিষয়কেও প্রতিফলিত করে। যেমন, নির্বাচনে স্বচ্ছতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, সংখ্যালঘুদের অধিকার, ইত্যাদি বিষয়গুলো তাত্ত্বিক এবং অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণ উভয় দিক থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সূচক হতে পারে । এই সূচকগুলোকে কার্যকর সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করে নিতে হয়।

কার্যকর সংজ্ঞা পরিমাপ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রত্যয়গত-তত্ত্বগত এবং অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণযোগ্য জগতের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন স্থাপন করে।

অতএব, পরিমাপ প্রক্রিয়াটি কার্যকর সংজ্ঞার ধারণার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কার্যকর সংজ্ঞা পরিমাপ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রত্যয়গত-তত্ত্বগত এবং অভিজ্ঞতালব্ধ-পর্যবেক্ষণযোগ্য জগতের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন স্থাপন করে। আরো সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় যে, পরিমাপ হলো এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে একজন গবেষক সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী অনুসরণ করে অভিজ্ঞতালব্ধ বৈশিষ্ট্যের প্রতি সংখ্যানির্দেশক প্রতীকী মান বরাদ্দ করেন। সংখ্যানির্দেশক প্রতীকগুলো কোন প্রপঞ্চ, বস্তু বা ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পরিমাপের সংজ্ঞাটিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্যণীয় – সংখ্যানির্দেশক প্রতীক (numerals), বরাদ্দকরণ (assignments) ও নিয়ম (rules)। এই তিনটি বিষয়ের আরো কিছুটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। একটি সংখ্যানির্দেশক প্রতীক, ১, ২, ৩, ৪, ইত্যাদির আকার ধারণ করে থাকে। কিন্তু যতক্ষণ না সংখ্যানির্দেশক এই প্রতীকগুলোর উপর কোন অর্থ আরোপ করা হয়, ততক্ষণ এগুলো কোন পরিমাণগত অর্থ বহন করে না। এই সংখ্যানির্দেশক প্রতীকগুলোর উপর পরিমাণগত অর্থ আরোপ করার পরই কেবলমাত্র সেগুলো সংখ্যা হয়ে উঠে। পরিমাপের ফলাফল হিসাবে বরাদ্দকৃত সংখ্যাগুলো বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনা, মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই সংখ্যাগুলো, বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যদ্বাণীকরণের লক্ষ্যে গাণিতিক ও পরিসংখ্যানগত কৌশল ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। এই পর্যায়ে, সংখ্যা পরিমাণগত বিশ্লেষণের যোগ্য হয়ে উঠে, যা গবেষণায় অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় সম্পর্কে নতুন তথ্যকে প্রকাশ করে।

পরিমাপের সংজ্ঞাটিতে তিনটি গরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয় সংখ্যানির্দেশক প্রতীক, বরাদ্দকরণ ও নিয়ম।

পরিমাপের সংজ্ঞায় বরাদ্দকরণ শব্দটির অর্থ হলো, কোন বস্তু, ব্যক্তি বা চলকের বিপরীতে সংখ্যানির্দেশক প্রতীকী মানের আরোপণ। প্রতীকী মানগুলো সংখ্যানির্দেশক না হয়ে গুণগত প্রতীকও হতে পারে। যেমন, লিঙ্গ চলকটির দু'টি মান রয়েছে – নারী ও পুরুষ। এই মান দু'টি গুণগত প্রতীকী মান। এই দু'টি মানের বিপরীতে সংখ্যানির্দেশক প্রতীক (যেমন, ১ ও ২) ব্যবহার করে এগুলোকে সংখ্যাসূচক করে তোলা যায়। সংখ্যা কিভাবে তথ্যকে আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়, তা বোঝার জন্য প্রাথমিক সংখ্যাগুলোর প্রকৃতি বুঝতে হবে এবং সেগুলো কি করে পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের মধ্যে প্রবেশ করে, তাও বুঝতে হবে। সেই সূত্র ধরে বলা যায় যে, লিঙ্গ চলকটির গুণগত প্রতীকী মানের (নারী ও পুরুষ) বিপরীতে ব্যবহৃত সংখ্যাসূচক প্রতীক দু'টিই (১ ও ২) প্রাথমিক সংখ্যার রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং এই সংখ্যনির্দেশক মান ব্যবহারের মাধ্যমেই প্রাথমিক সংখ্যাগুলো পরিসংখ্যাণগত বিশ্লেষণে প্রবেশ করেছে। এই পুরো প্রক্রিয়াটিই পরিমাপ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলীর দ্বারা পরিচালিত।

যে কোন বস্তুর প্রতি সংখ্যানির্দেশক প্রতীক বরাদ্দের কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী রয়েছে। যেমন, গবেষক কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী 'একটি শাসন ব্যবস্থা যদি পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক হয়, তবে সে ক্ষেত্রে ১৫ নম্বর দেয়া যেতে পারে, যদি কোনভাবেই গণতান্ত্রিক না হয়, তবে ১০ নম্বর দেয়া যেতে পারে। মধ্যবর্তী ব্যবস্থাগুলোকে ১১-১৪ নম্বর দেয়া যেতে পারে'। মান বরাদ্দের এই নিয়মগুলো পরিমাপ পদ্ধতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই নিয়মগুলো পরিমাপের গুণগত মানকে নির্ধারণ করে। সঠিক

নিয়মাবলী অনুসরণ না করলে, সংগৃহীত উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। উপসংহারে বলা যায় যে, পরিমাপ প্রক্রিয়া হলো যে কোন গবেষণা ও পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের মেরুদন্ড, যা দুর্বল হলে যে কোন গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ ব্যাহত হতে বাধ্য। একটি গবেষণার মান শুধুমাত্র যথাযথ গবেষণা নক্শার উপরই নির্ভর করে না, এটি গবেষণায় ব্যবহৃত পরিমাপ প্রক্রিয়ার মানের উপরও নির্ভরশীল।

একটি গবেষণার মান শুধুমাত্র যথাযথ গবেষণা নক্শার উপরই নির্ভর করে না, এটি গবেষণায় ব্যবহৃত পরিমাপ প্রক্রিয়ার মানের উপরও নির্ভরশীল।

সারাংশ

গবেষণা শুরুর পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রত্যয়ের সঠিক পরিমাপ। এই পরিমাপ নির্ভর করে প্রত্যয়ের সঠিক পরিমাপের ধাপগুলোকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করার মধ্যে। এই পাঠে আমরা প্রত্যয়ের সাথে সম্পর্কিত প্রত্যয়গত-তত্ত্বগত ও কার্যকর-অভিজ্ঞতালব্ধ সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেছি। পরিমাপের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি একজন গবেষককে মনে রাখতে হবে তা হলো, প্রত্যয়ের সুস্পষ্ট সংজ্ঞায়ন। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রত্যয়কে/প্রত্যয়গুলোকে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়নের উপর নির্ভর করে বিষয়বস্তুর স্পষ্টতা। বিষয়বস্তু যদি স্পষ্ট না হয়, তাহলে গবেষণায় যথাযথ ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন –

১। প্রত্যয়ের ব্যবহারের সূক্ষতা ও সুস্পষ্টতা অর্জন করতে হলে একজন বিজ্ঞানীকে:

ক. তার ব্যবহারের পদাবলীকে বর্ণনা করতে হবে
খ. তার ব্যবহারের পদাবলীকে ব্যাখ্যা করতে হবে
গ. তার ব্যবহারের পদাবলীকে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে
ঘ. উপরের সব।

২। প্রত্যয়গত সংজ্ঞা _____ ধরণের পদ নিয়ে গঠিত।

ক. দুই
খ. তিন
গ. চার
ঘ. পাঁচ

৩। প্রত্যয়গত ভাবের আদান প্রদান শক্তিশালী করে তোলার জন্য:

ক. প্রত্যয়কে সংজ্ঞায়িত করতে হয়
খ. প্রত্যয়ের সংজ্ঞা কোনভাবেই বৃত্তাকারে পরিভ্রাম্যমান হতে পারবে না
গ. সংজ্ঞাকে ধনাত্মকভাবে উপস্থাপন করতে হবে
ঘ. উপরের সব।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। প্রত্যয়গত-তত্ত্বগত সংজ্ঞা কী?

২। কার্যকর-অভিজ্ঞতালব্ধ সংজ্ঞা কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পরিমাপ প্রক্রিয়ায় প্রত্যয়গত-তত্ত্বগত ও কার্যকর-অভিজ্ঞতালব্ধ সংজ্ঞার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২। সমাজ গবেষণায় সংজ্ঞায়নের গুরুত্ব উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

পাঠ - ২

পরিমাপের মাত্রা - ১: নামসূচক ও ক্রমসূচক
Levels of Measurement – 1: Nominal and Ordinal

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- পরিমাপের মাত্রা
- নামসূচক মাত্রা
- ক্রমসূচক মাত্রা

পরিমাপের মাত্রা (Levels of Measurement)

কোন বস্তু বা ঘটনার প্রতি সংখ্যামূলক প্রতীক বরাদ্দের প্রক্রিয়াকে পরিমাপ বলে।

প্রত্যয়ের পর্যবেক্ষণযোগ্য সকল বৈশিষ্ট্য বা সূচককে একই মাত্রায় পরিমাপ করা যায় না বলে বিজ্ঞানীরা পরিমাপের বিভিন্ন মাত্রা ব্যবহার করে থাকেন। পর্যবেক্ষণযোগ্য বৈশিষ্ট্যের প্রতি বরাদ্দকৃত প্রতীকগুলোর (যা গুণগত বা পরিমাণগত উভয়ই হতে পারে) মধ্যে একটি কাঠামোর সমধর্মিতা (similarity of structure) থাকার ফলে পরিমাপের মাত্রা বিভিন্ন হয়ে থাকে। পরিমাপ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, একটি প্রত্যয় পরিমাপ করার জন্য যে সংখ্যাসূচক প্রক্রিয়াটি (numerical system) ব্যবহার করা হয়, সেটি সেই প্রত্যয়ের কাঠামোর সাথে সমধর্মী কিনা। নির্ধারিত নিয়মের ভিত্তিতে কোন বস্তু বা ঘটনার প্রতি সংখ্যামূলক প্রতীক বরাদ্দের প্রক্রিয়াকে পরিমাপ বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যেহেতু সবকিছুকে একসাথে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয় বা কাঙ্ক্ষিতও নয়, সেহেতু কোন বস্তু, ঘটনা বা ব্যক্তিকে তাদের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধকরণ করা প্রয়োজন। পরিমাপ প্রক্রিয়া গবেষককে সে ধরণের শ্রেণীবদ্ধকরণে সক্ষম করে।

তবে এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিভিন্ন চলকের বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে বরাদ্দকৃত সংখ্যার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। গবেষণা প্রক্রিয়ার বিশেষ ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন চলকের বৈশিষ্ট্যগুলোর বিপরীতে বরাদ্দকৃত সংখ্যার বিভিন্ন অর্থও রয়েছে। যেমন, ধরা যাক, একটি গবেষণায় গবেষক সন্তান সংখ্যা ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক অনুসন্ধানে আগ্রহী। সে ক্ষেত্রে, তিনি মুসলমান ধর্মের জন্য ১, হিন্দু ধর্মের জন্য ২, খৃষ্টান ধর্মের জন্য ৩, বৌদ্ধ ধর্মের জন্য ৪ এবং অন্যান্য ধর্মের জন্য ৫ সংখ্যাকে বরাদ্দ করেছেন। একইসাথে, তিনি উত্তরদাতাদের সন্তান সংখ্যাকেও লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই সংখ্যাগুলো, ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫ থেকে বহু সংখ্যক সন্তানের সংখ্যা হতে পারে। এই দু' ধরণের সংখ্যা সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন অর্থ বহন করে। সন্তান সংখ্যার ক্ষেত্রে গবেষক অর্থবহভাবে উত্তরদাতাদের জন্য গড় সংখ্যক সন্তানের কথা বলতে পারেন, কিন্তু গড় ধর্ম নির্ণয়ের চেষ্টা হবে অযৌক্তিক। ঐতিহ্যগতভাবে, সংশ্লিষ্ট চলকের পরিমাপের মাত্রার ভিত্তিতে সংখ্যাকে চারটি বিভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরিমাপের মাত্রাগুলোকে নিম্ন থেকে উচ্চ ক্রমপরম্পরায় বিবেচনা করা হয় এবং সেই ক্রমধারায় সেগুলো হলো, নামসূচক, ক্রমসূচক, ব্যাপ্তিমূলক ও অনুপাতমূলক পরিমাপের মাত্রা। এই পাঠে আমরা প্রথম দু'টি পরিমাপের মাত্রা নিয়ে আলোচনা করবো – নামসূচক ও ক্রমসূচক।

পরিমাপের মাত্রাগুলোকে নিম্ন থেকে উচ্চ ক্রমপরম্পরায় বিবেচনা করা হয় এবং সেই ক্রমধারায় সেগুলো হলো, নামসূচক, ক্রমসূচক, ব্যাপ্তিমূলক ও অনুপাতমূলক পরিমাপের মাত্রা।

পরিমাপের মাত্রার (Levels of measument) পরিবর্তে অনেকে পরিমাপের মাপনী (scales of measurement) পদটিকে ব্যবহার করেন। একটি মাপনীকে (scale) পরিমাপের হাতিয়ার হিসাবে ভাবা যেতে পারে। যেমন, মোটর গাড়ীর গতিবেগ নির্দেশক যন্ত্র, কাপড় মাপার ফিতা, তুলাদন্ড, নিক্তি, দাঁড়িপাল্লা, ওজন নেবার যন্ত্র হলো এ ধরণের কিছু মাপনী। পরিমাপের মাত্রা ও মাপনীর মধ্যেকার পার্থক্যটি সবসময় স্পষ্ট নয়। যেমন, বলা যায় যে, পরিমাপের চারটি মাত্রায় চারটি মাপনী রয়েছে — নামসূচক, ক্রমসূচক, ব্যাপ্তিমূলক ও অনুপাতমূলক। কিন্তু মাপনীরও বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে, যা

আমরা পাঠ ৬-এ আলোচনা করবো। বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য এই পাঠে আমরা পরিমাপের মাত্রা পদটিকে ব্যবহার করবো।

নামসূচক মাত্রা (Nominal Level)

যে কোন বিজ্ঞানের মৌলিক ও প্রাথমিক কাজ হলো শ্রেণীবদ্ধকরণ। পরিমাপের নামসূচক মাত্রা সেই প্রাথমিক কাজটি সম্পন্ন করে।

যে কোন বিজ্ঞানের মৌলিক ও প্রাথমিক কাজ হলো শ্রেণীবদ্ধকরণ। পরিমাপের নামসূচক মাত্রা সেই প্রাথমিক কাজটি সম্পন্ন করে। নামসূচক মাত্রাটি হলো পরিমাপের সবচেয়ে সরল মাত্রা। এই পর্যায়ে, পর্যবেক্ষণগুলোকে কতগুলো সমবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দফা বা গোষ্ঠীতে (categories) শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য সংখ্যা বা অন্যান্য প্রতীককে ব্যবহার করা হয়। এই শ্রেণীবদ্ধ সমবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দফা বা গোষ্ঠীগুলোকে আমরা কতগুলো সুবিধাজনক নাম দিয়ে থাকি। যেমন, সংখ্যাসূচক প্রতীক ১ ও ২ দিয়ে আমরা একটি জনগোষ্ঠীকে নারী ও পুরুষ এই দু'টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করতে পারি, নারীর বিপরীতে ১ ও পুরুষের বিপরীতে ২ সংখ্যাসূচক প্রতীক বরাদ্দের মাধ্যমে। একই জনগোষ্ঠীকে আবার ধর্মের ভিত্তিতেও শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। মুসলিম, হিন্দু, খৃষ্টান, ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের যথাক্রমে, ১, ২, ৩, ও ৪ সংখ্যাসূচক প্রতীক বরাদ্দ করে। নামসূচক পরিমাপের মাধ্যমে আমরা একটি গোষ্ঠী থেকে আরেকটি গোষ্ঠীর পার্থক্য নির্ধারণ করে থাকি। যেমন, নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য। জাতীয়তা, বৈবাহিক মর্যাদা, আঞ্চলিকতা, রাজনৈতিক দল, ইত্যাদি হলো নামসূচক মাত্রায় পরিমাপকৃত চলকের কিছু উদাহরণ।

নামসূচক পরিমাপের মাধ্যমে আমরা একটি গোষ্ঠী থেকে আরেকটি গোষ্ঠীর পার্থক্য নির্ধারণ করে থাকি।

পরিসংখ্যানগত কৌশল প্রয়োগের জন্য শ্রেণীবদ্ধ গোষ্ঠীগুলোকে ন্যূনতমপক্ষে দু'টি শর্ত পূরণ করতে হবে। একটি হলো, পুঙ্খানুপুঙ্খতা (exhaustiveness) এবং অন্যটি হলো, বিশিষ্টতা (exclusiveness)। অর্থাৎ, একটি গোষ্ঠীকে পুঙ্খানুপুঙ্খ হতে হলে, সেই গোষ্ঠীর একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সকল বস্তু, ঘটনা বা পর্যবেক্ষণের সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তিকরণ হতে হবে। অর্থাৎ, কোন পর্যবেক্ষণকেই গণনা থেকে বাদ দেয়া যাবে না। আর বিশিষ্টতা হলো, কোন পর্যবেক্ষণকেই একটি গোষ্ঠীর অতিরিক্ত অন্য কোন গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত না করা। অর্থাৎ, যুগপৎভাবে একটি ঘটনা, বস্তু বা পর্যবেক্ষণকে একের অধিক গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। অন্য কথায়, দু'টি বৈশিষ্ট্যকে একই প্রতীকে চিহ্নিত করা যাবে না। যেমন, পুরুষকে পুরুষ গোষ্ঠীতে এবং নারীকে নারী গোষ্ঠীতেই শুধুমাত্র অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

নামসূচক মাত্রার দু'টি গাণিতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি হলো, প্রতিসাম্যতা (symmetry) এবং অন্যটি হলো, সকর্মকতা (transitivity)। প্রতিসাম্যতা বলতে আমরা বুঝি যে, যদি ক ও খ-এর মধ্যে সম্পর্কটি সত্য হয়, তবে সেই সম্পর্কটি খ ও ক-এর মধ্যেও সত্য হবে। অর্থাৎ,

যদি ক = খ হয়, তবে খ = ক হবে।

একটি উদাহরণ দেয়া যাক। করিম ও রহিম প্রতিসম। কারণ, দু'জনই পুরুষ। যে সকল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রচিত হয়েছে এবং করিম ও রহিমকে পুরুষ বলা হয়েছে, সেই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই এই প্রতিসাম্যতা তৈরি হয়েছে। যেমন, করিম একজন পুরুষ, রহিমও একজন পুরুষ। কাজেই,

করিম = রহিম, এবং রহিম = করিম।

তবে এটি মনে রাখতে হবে যে, এখানে প্রতিসাম্যতাটি তৈরি হয়েছে শুধুমাত্র লিঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে, অন্য কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়। সকর্মকতা বলতে আমরা বুঝি যে,

যদি, ক = খ এবং খ = গ হয়, তবে ক = গ হবে।

আবারও আমরা পূর্বের উদাহরণটি ব্যবহার করতে পারি।

যদি, করিম = রহিম এবং রহিম = ফরিদ হয়, তবে করিম = ফরিদ, বা ফরিদ = করিম হবে।

নামসূচক মাত্রার মাধ্যমে আমরা কেবলমাত্র চিহ্নিতকরণ, শ্রেণীবদ্ধকরণ বা গোষ্ঠীবদ্ধকরণ করতে পারি। এই মাত্রায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আমরা কেবলমাত্র ভিন্নতা নিরূপণ করতে পারি, কিন্তু কোন গুণগত (ভালো/মন্দ) পূর্ব ধারণা অনুমান করতে পারি না। গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ভালো-মন্দ বা কম-বেশী জাতীয় কোন গুণাগুণ বিচার করতে হলে, আমাদের গুণবাচক পরিমাপের মাত্রা ব্যবহার করতে হবে।

নামসুচক মাত্রায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আমরা কেবলমাত্র ভিন্নতা নিরূপণ করতে পারি, কিন্তু কোন গুণগত (ভালো/মন্দ) পূর্ব ধারণা অনুমান করতে পারি না।

ক্রমসূচক মাত্রা (Ordinal Level)

সামাজিক গবেষক এমন অনেক চলক ব্যবহার করেন, যেগুলো শ্রেণীবদ্ধকরণের পাশাপাশি কিছু সম্পর্কও প্রদর্শন করে। সচরাচর দেখা যায় এমন সম্পর্কগুলো হলো, বৃহত্তর-ক্ষুদ্রতর, উচ্চতর-নিম্নতর, ইত্যাদি। এই সম্পর্কগুলো '>' ও '<' প্রতীক দু'টি দিয়ে দেখানো হয়ে থাকে। যেমন, শ্রেণী কাঠামোয় উচ্চ শ্রেণী, মধ্য শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণী একটি ক্রমধারার সম্পর্ক প্রদর্শন করে। এ ক্ষেত্রে, উচ্চ শ্রেণী মধ্য শ্রেণীর তুলনায় এবং মধ্য শ্রেণী নিম্ন শ্রেণীর তুলনায় অধিকতর সামাজিক মর্যাদা ভোগ করে। অর্থাৎ,

উচ্চ শ্রেণী > মধ্য শ্রেণী > নিম্ন শ্রেণী।

অথবা, নিম্ন শ্রেণী < মধ্য শ্রেণী < উচ্চ শ্রেণী।

নামসূচক মাত্রার মত ক্রমসূচক মাত্রায়ও পুঙ্খানুপুঙ্খতা ও বিশিষ্টতার বৈশিষ্ট্য দু'টি কার্যকর থাকে। অর্থাৎ, শ্রেণীবদ্ধকরণ বা গোষ্ঠীবদ্ধকরণে প্রতিটি ঘটনাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং একটি ঘটনাকে কেবলমাত্র একটি শ্রেণী বা গোষ্ঠীতেই অন্তর্ভুক্ত করা যাবে, অন্যটিতে নয়। ক্রমসূচক মাত্রার তিনটি গাণিতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমটি হলো, অনাত্মবাচকতা (irreflexivity), দ্বিতীয়টি হলো, অপ্রতিসাম্যতা (asymmetry), এবং তৃতীয়টি হলো, সকর্মকতা (transitivity)। অনাত্মবাচকতা হলো সম্পর্কের মধ্যে একটি যৌক্তিক বৈশিষ্ট্য, যা যে কোন একটি বস্তু বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে সত্য হলে, সেই ব্যক্তি বা বস্তু কখনও সেই একই ব্যক্তি বা বস্তুর চেয়ে উচ্চতর বা নিম্নতর হতে পারে না। যেমন, করিম সাহেব কখনো করিম সাহেবের চেয়ে উচ্চতর বা নিম্নতর অবস্থানে অবস্থান করতে পারেন না। অর্থাৎ,

করিম সাহেব > করিম সাহেব, বা করিম সাহেব < করিম সাহেব হতে পারে না।

অপ্রতিসাম্যতা বলতে আমরা বুঝি যে, ক যদি খ অপেক্ষা বৃহত্তর হয়, তবে খ কখনও ক অপেক্ষা বৃহত্তর হতে পারে না। অর্থাৎ,

যদি ক > খ হয়, তবে খ > ক হতে পারে না।

আর সকর্মকতার সম্পর্কটি হলো,

যদি ক > খ এবং খ > গ হয়, তবে ক > গ হবে।

আমরা সামাজিক মর্যাদায় শ্রেণী কাঠামোর উদাহরণটি দিয়ে এই তিনটি গাণিতিক সম্পর্ককে সহজেই বুঝতে পারি। যেমন,

উচ্চ শ্রেণী > উচ্চ শ্রেণী হতে পারে না।

যদি উচ্চ শ্রেণী > মধ্য শ্রেণী হয়, তবে মধ্য শ্রেণী > উচ্চ শ্রেণী হতে পারে না।

যদি উচ্চ শ্রেণী > মধ্য শ্রেণী এবং মধ্য শ্রেণী > নিম্ন শ্রেণী হয়, তবে উচ্চ শ্রেণী > নিম্ন শ্রেণী হবে।

ক্রমসূচক মাত্রায় পরিমাপকৃত চলকের উদাহরণ হিসাবে মনোভাব (attitude) চলকটিকে বিবেচনা করা যেতে পারে। গবেষকগণ মনোভাব পরিমাপ করতে গিয়ে ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু মতামতমূলক বিষয়ের উল্লেখ করে থাকেন, যা উচ্চ বা নিম্ন ক্রমধারায় সাজানো থাকে। যেমন,

সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা হিসাবে পুলিশ বাহিনীকে

- আধুনিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে
- আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করতে হবে
- স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ দিতে হবে
- প্রয়োজনবোধে সন্ত্রাসীকে অপরাধ করা কালে গুলি করার ক্ষমতা দিতে হবে

ধরা যাক, এই প্রশ্নগুলোর বিপরীতে চার ধরণের উত্তর সাজানো রয়েছে। যেমন,

☐ পুরোপুরি একমত	☐ একমত	☐ একমত নয়	☐ পুরোপুরি একমত নয়

উপরিল্লিখিত মতামতগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রথম মতামতটি থেকে দ্বিতীয় মতামতটি কিছু শক্ত মনোভাব প্রদর্শন করে। একইভাবে, দ্বিতীয়টি থেকে তৃতীয়টি এবং তৃতীয়টি থেকে চতুর্থটি আরো বেশী কঠিন মনোভাব প্রদর্শন করে। উত্তরগুলোর মধ্যেও একই ধরণের মনোভাবের কাঠামো প্রদর্শিত হয়। যদি প্রথম উত্তরটিকে ৪, দ্বিতীয়টিকে ৩, তৃতীয়টিকে ২, এবং চতুর্থটিকে ১ মান বরাদ্দ করা হয়, তবে যে ব্যক্তি চারটি প্রশ্নের ক্ষেত্রে পুরোপুরি একমত পোষণ করবেন, সেই ব্যক্তির মান হবে ১৬, এবং যে ব্যক্তি পুরোপুরি দ্বিমত পোষণ করবেন, তার মান হবে ৪। অর্থাৎ, ১৬ মানধারী ব্যক্তি পুলিশকে চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদানের মনোভাবসম্পন্ন এবং ৪ মানধারী ব্যক্তি পুলিশকে কোন প্রকার ক্ষমতা প্রদানে অনাগ্রহী মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হবেন। মনোভাব ছাড়াও, সামাজিক বিজ্ঞানীরা যে সকল ক্রমসূচক চলক ব্যবহার করে থাকেন, সেগুলো হলো সামাজিক শ্রেণী, পরীক্ষার গ্রেড, কোন প্রতিষ্ঠানের ক্রমধারার অবস্থান, ইত্যাদি।

ক্রমসূচক মাত্রায় আমরা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কেবল শ্রেণীবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধই করতে পারি না, আমরা এর গুণাগুণও আরোপ করতে পারি।

ক্রমসূচক মাত্রা নামসূচক মাত্রার চেয়ে কিছুটা উন্নত। কারণ, নামসূচক মাত্রায় নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শুধুমাত্র শ্রেণীবদ্ধ করা যায়, কিন্তু কোন গুণগত মান আরোপ করা যায় না। অর্থাৎ, পুরুষ ও নারীর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে দু'টি গোষ্ঠীকে আলাদা করা গেলেও নারী অপেক্ষা পুরুষ শ্রেয় কি না তা নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু ক্রমসূচক মাত্রায় আমরা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কেবল শ্রেণীবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধই করতে পারি না, আমরা এর গুণাগুণও আরোপ করতে পারি। যেমন, পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি, এবং এও বলতে পারি যে, প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা দ্বিতীয় শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো মানের।

ক্রমসূচক মাত্রার সীমাবদ্ধতাটি হলো যে, এই মাত্রায় পরিমাপকৃত চলকের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পার্থক্যের ব্যবধান বা ব্যাপ্তিটি নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

তবে, ক্রমসূচক মাত্রার সীমাবদ্ধতাটি হলো যে, এই মাত্রায় পরিমাপকৃত চলকের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পার্থক্যের ব্যবধান বা ব্যাপ্তিটি নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ, একটি উপাদান অন্য একটি উপাদান থেকে কতটুকু বৃহত্তর বা শ্রেষ্ঠতর, তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। যেমন, আমরা শুধু জানতে পারি যে, ক খ অপেক্ষা বৃহত্তর। কিন্তু আমরা বলতে পারি না কতটুকু বৃহত্তর। আমরা এও বলতে পারি না যে, ক ও খ-এর মধ্যেকার পার্থক্যটি গ ও ঘ-এর মধ্যেকার পার্থক্যটির চেয়ে কম বা বেশী। এটি নির্ণয় করতে হলে, আমাদের ব্যাপ্তিমূলক মাত্রার সাহায্য নিতে হবে।

সারাংশ

গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়গুলোর বৈশিষ্ট্য ও সূচকগুলোকে বিভিন্ন মাত্রায় পরিমাপ করা হয়। বর্তমান পাঠে আমরা দু'টি পরিমাপের মাত্রা নিয়ে আলোচনা করেছি —— নামসূচক ও ক্রমসূচক মাত্রা। নামসূচক

মাত্রায় সংখ্যা বা অন্যান্য প্রতীককে ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণগুলোকে কতগুলো সমবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দফা বা গোষ্ঠীতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। নামসূচক পরিমাপের সাথে ক্রমসূচক পরিমাপের পার্থক্যটি হলো যে, নামসূচক মাত্রায় নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শুধুমাত্র শ্রেণীবদ্ধ করা যায়, কিন্তু ক্রমসূচক মাত্রায় বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর গুণগত মান আরোপ করা যায়। একজন গবেষককে গবেষণা শুরু করার আগেই ঠিক করে নিতে হবে, কোন ধরণের পরিমাপ তিনি ব্যবহার করবেন। পরিমাপের ধরণ নির্ধারণের পূর্বে গবেষককে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রত্যয়গুলো সম্পর্কে যথাযথ ধারণা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন –

১। প্রতিসাম্যতা এবং সকর্মতা হলো:

ক. নামসূচক মাত্রার বৈশিষ্ট্য
খ. ক্রমসূচক মাত্রার বৈশিষ্ট্য
গ. ব্যাপ্তিমূলক মাত্রার পরিমাপ
ঘ. উপরের সব।

২। শ্রেণীবদ্ধকরণের পাশাপাশি কিছু সম্পর্ক প্রদর্শন করে:

ক. ক্রমসূচক মাত্রার পরিমাপে
খ. অনুপাতসূচক মাত্রার পরিমাপে
গ. ব্যাপ্তিমূলক মাত্রার পরিমাপে
ঘ. উপরের সব।

৩। ক্রমসূচক মাত্রার সীমাবদ্ধতাটি হলো, পরিমাপকৃত চলকের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পার্থক্যের ব্যবধান _____।

ক. নির্ণয় করা কিছুটা সম্ভব
খ. নির্ণয় করা মোটামোটি সম্ভব
গ. নির্ণয় করা সম্ভব নয়
ঘ. নির্ণয় করা বিবেচনায় আসে না

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। নামসূচক পরিমাপ কী?

২। ক্রমসূচক পরিমাপ কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সমাজ গবেষণায় পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

২। নামসূচক এবং ক্রমসূচক পরিমাপের পার্থক্য উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

পাঠ - ৩

পরিমাপের মাত্রা - ২: ব্যাপ্তিমূলক ও অনুপাতমূলক
Levels of Measurement – 2: Interval and Ratio

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- ব্যাপ্তিমূলক মাত্রা
- অনুপাতমূলক মাত্রা
- পরিমাপের চারটি মাত্রার মধ্যে তুলনা

ব্যাপ্তিমূলক মাত্রা (Interval Level)

শ্রেণীবদ্ধকরণ এবং গুণগত ক্রমধারার সম্পর্ক স্থাপনের পাশাপাশি, একটি পর্যবেক্ষণ থেকে আরেকটি পর্যবেক্ষণ ঠিক কত এককের ব্যবধানে অবস্থান করে, তা ব্যাপ্তিমূলক মাত্রার মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব।

পাঠ ২-এ আমরা জেনেছি যে, নামসূচক মাত্রা পর্যবেক্ষণকে কেবলমাত্র শ্রেণীবদ্ধ করে এবং ক্রমসূচক মাত্রা আমাদের আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে শ্রেণীবদ্ধকরণের পাশাপাশি পর্যবেক্ষণসমূহের মধ্যে গুণগত ক্রমধারার একটি সম্পর্ক স্থাপন করে। কিন্তু আমরা এও জানি যে, ক্রমসূচক মাত্রায় পরিমাপের মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত এই পর্যবেক্ষণগুলোর মধ্যে ব্যবধানের মাত্রাটি নির্ধারণ করা যায় না। যদি আমরা প্রতিটি পর্যবেক্ষণের মধ্যেকার প্রকৃত ব্যবধানটি জানতে পারি, তবে আমরা পরিমাপের ব্যাপ্তিমূলক মাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হই। অর্থাৎ, শ্রেণীবদ্ধকরণ এবং গুণগত ক্রমধারার সম্পর্ক স্থাপনের পাশাপাশি, একটি পর্যবেক্ষণ থেকে আরেকটি পর্যবেক্ষণ ঠিক কত এককের ব্যবধানে অবস্থান করে তা ব্যাপ্তিমূলক মাত্রার মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব। যেমন, ব্যাপ্তিমূলক মাত্রায় পরিমাপের মাধ্যমে আমরা শুধুমাত্র এটুকুই বলতে পারি না যে, করিম সাহেব রহিম সাহেবের চেয়ে বেশী আয় করেন, আমরা এও বলতে সক্ষম হই যে, করিম সাহেব রহিম সাহেবের চেয়ে ৫০০০ টাকা বেশী আয় করেন। এই পরিমাণগত তুলনাটি করতে হলে আমাদের অবশ্যই একটি পরিমাপের সূক্ষ্ম একক থাকতে হবে এবং পর্যবেক্ষণের প্রতিটি এককের মধ্যেকার ব্যবধানটি সমান হতে হবে।

ব্যাপ্তিমূলক মাত্রার গাণিতিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

- **অনন্যতা (uniqueness):** যদি ক ও খ দু'টি প্রকৃত সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে, তবে ক+খ ও ক×খ একটি এবং একমাত্র একটি প্রকৃত সংখ্যাকে প্রতিনিধিত্ব করে।
- **প্রতিসাম্যতা (symmetry):** যদি ক = খ হয়, তবে খ = ক হবে।
- **বিনিময়যোগ্যতা (commutation):** যদি ক ও খ প্রকৃত সংখ্যাকে নির্দেশ করে, তবে ক + খ = খ + ক ও কখ = খক হবে।
- **প্রতিকল্পনা (substitution):** যদি ক = খ ও ক + গ = ঘ হয়, তবে খ + গ = ঘ; এবং যদি ক = খ ও কগ = ঘ হয়, তবে খগ = ঘ হবে।
- **সংসর্গতা (association):** যদি ক, খ ও গ প্রকৃত সংখ্যাকে নির্দেশ করে, তবে (ক + খ) + গ = ক + (খ + গ) ও (কখ) গ = ক (খগ) হবে।

ব্যাপ্তিমূলক মাত্রার সাথে নামসূচক ও ক্রমসূচক মাত্রার প্রধান পার্থক্যটি হলো, ব্যাপ্তিমূলক মাত্রায় পরিমাপকৃত চলকগুলোর মধ্যে পরিমাপের একটি পরিমিত একক রয়েছে এবং একটি একক থেকে অন্য এককের সমান দূরত্ব রয়েছে।

ব্যাপ্তিমূলক মাত্রার সাথে নামসূচক ও ক্রমসূচক মাত্রার প্রধান পার্থক্যটি হলো, ব্যাপ্তিমূলক মাত্রায় পরিমাপকৃত চলকগুলোর মধ্যে পরিমাপের একটি পরিমিত একক (standard unit) রয়েছে এবং একটি একক থেকে অন্য এককের সমান দূরত্ব রয়েছে।

শিক্ষা ব্যাপ্তিমূলক মাত্রায় পরিমাপকৃত একটি চলক। শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে আমরা বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত করতে পারি এবং সেই গোষ্ঠীগুলো একটি গুণগত সম্পর্কের ক্রমধারা তৈরি করে। যেমন, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করলে আমরা একজন ব্যক্তিকে প্রাথমিক শিক্ষায়

শিক্ষিত বলে থাকি, দশম শ্রেণী সমাপ্ত করলে আমরা মাধ্যমিক, বারো বছর সমাপ্ত করলে উচ্চ মাধ্যমিক, কমপক্ষে চৌদ্দ বছর সমাপ্ত করলে স্নাতক এবং ষোল বছর সমাপ্ত করলে স্নাতকোত্তর শিক্ষায় শিক্ষিত বলে অভিহিত করি। এ ক্ষেত্রে, শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন নামকরণের মাধ্যমে নামসূচক মাত্রার কার্যটি সম্পাদিত হয়েছে।

যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষার তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চতর। মাধ্যমিক শিক্ষার তুলনায় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চতর, এবং স্নাতক শিক্ষার তুলনায় স্নাতকোত্তর শিক্ষা উচ্চতর, সেহেতু শিক্ষার এই শ্রেণীগুলো একটি সম্পর্কের ক্রমধারা স্থাপনের মধ্য দিয়ে পরিমাপের ক্রমসূচক মাত্রার কার্যটি সম্পাদন করছে। যে বিষয়টি এখানে লক্ষ্যণীয় সেটি হলো, প্রথম শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত সমাপ্ত করতে একজন ছাত্র/ছাত্রীকে প্রতিটি শ্রেণীতে এক বছর সময়কাল অতিক্রম করে একটি বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। অর্থাৎ, এখানে একটি পরিমিত এককের পরিমাপ অনুসরণ করা হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণীকে এক একটি একক হিসাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান হলো এক বছরের। এই এক বছরের ব্যবধানটি প্রতিটি শ্রেণীর জন্য সমান ও অপরিবর্তনীয়। আয়, বুদ্ধিমত্তা, ভোটদানে সক্ষম জনগোষ্ঠী, জন্মহার, ইত্যাদি হলো ব্যাপ্তিমূলক মাত্রায় পরিমাপকৃত চলকের কিছু উদাহরণ।

ব্যাপ্তিমূলক মাত্রার সীমাবদ্ধতাটি হলো, এই মাত্রায় পরিমাপকৃত চলকগুলোর সুনির্দিষ্ট কোন সূচনাস্থল বা উৎপত্তিস্থল নেই, যা একটি স্বাভাবিক নিরঙ্কুশ শূন্য অবস্থান দিয়ে চিহ্নিত করা হয়।

ব্যাপ্তিমূলক মাত্রার সীমাবদ্ধতাটি হলো, এই মাত্রায় পরিমাপকৃত চলকগুলোর সুনির্দিষ্ট কোন সূচনাস্থল বা উৎপত্তিস্থল (definite origin) নেই, যা একটি স্বাভাবিক নিরঙ্কুশ শূন্য অবস্থান (absolute natural zero point) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। এই সূচনাস্থলটি জানা না থাকলে, এই মাত্রায় প্রাপ্ত পরিসংখ্যানগত উপাত্তগুলো উচ্চতর পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণে সমস্যা তৈরি করে।

অনুপাতমূলক মাত্রা (Ratio Level)

যে সব চলকের স্বাভাবিক নিরঙ্কুশ শূন্য অবস্থান বিন্দু রয়েছে বা নির্দিষ্ট একটি উৎপত্তিস্থল রয়েছে, সে সব চলককে অনুপাতমূলক মাত্রায় পরিমাপ করা য়ায়।

যে সব চলকের স্বাভাবিক নিরঙ্কুশ শূন্য অবস্থান বিন্দু রয়েছে, বা নির্দিষ্ট একটি উৎপত্তিস্থল রয়েছে, সে সব চলককে অনুপাতমূলক মাত্রায় পরিমাপ করা যায়। ওজন, সময়, বয়স, তাপমাত্রা, দৈর্ঘ্য, ইত্যাদি হলো অনুপাতমূলক মাত্রায় পরিমাপযোগ্য চলকের কিছু উদাহরণ। ব্যাপ্তিমূলক ও অনুপাতমূলক মাত্রা একই ধরণের এবং যে নিয়মাবলী অনুসরণ করে চলকসমূহের প্রতি সংখ্যা আরোপ করা হয়, সেগুলোও একই রকম, শুধু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। সেই ব্যতিক্রমটি হলো যে, অনুপাতমূলক মাত্রার ক্ষেত্রে সব ধরণের গাণিতিক বা পরিসংখ্যানিক কর্মকান্ড শুরু হয় একটি নিরঙ্কুশ শূন্য অবস্থান বিন্দু থেকে। অন্য দিকে, ব্যাপ্তিমূলক মাত্রার ক্ষেত্রে সে সকল কর্মকান্ড শুরু হয় একটি স্বেচ্ছামূলক সূচনাস্থল থেকে।

বয়স চলকটিকে একটি উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। একটি শিশুর জন্মের পর থেকে এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার বয়স ধরা হয় শূন্য বছর। অর্থাৎ, একজন ব্যক্তির বয়স গণনা শুরু হয় শূন্য বছর থেকে। অন্য কথায়, বয়স চলকটির স্বাভাবিক উৎপত্তিস্থল হলো জন্মের সময়টি। এই উৎপত্তিস্থলটি প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্ট, কৃত্রিমভাবে নয়। কিন্তু ব্যাপ্তিমূলক মাত্রায়, যে কোন স্থান থেকে গণনা শুরু হতে পারে। যেমন, সন্তান জন্মদানে সক্ষম নারীদের বয়স গণনাসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার গাণিতিক কর্মকান্ড শুরু হয় ১৫ বছর বয়স থেকে এবং শেষ করা হয় ৪৯ বছরে। কারণ, এই চলকটিকে এভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ভোটদানে সক্ষম ব্যক্তিদের গণনা করা হয় ১৮ বছর বয়স থেকে। কারণ, ১৮ বছর বয়সকে প্রাপ্তবয়স্কতার মানদন্ড হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই প্রাপ্তবয়স্কতাই ভোটদানের যোগ্যতাকে নিরূপণ করে।

তাপমাত্রা হলো অনুপাতমূলক মাত্রায় পরিমাপকৃত এমন আরেকটি চলক, যার একটি প্রাকৃতিক ও নির্দিষ্ট শূন্য উৎপত্তিস্থল রয়েছে। কারণ, পানি শূন্য তাপমাত্রাতেই বরফে পরিণত হয়। কিন্তু যখন একজন চিকিৎসক একজন ব্যক্তির শরীরে জ্বরের তাপমাত্রা পরিমাপ করেন, তখন তিনি দেখেন যে, তাপমাত্রা ৯৮.৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট অতিক্রম করেছে কিনা। যদি সেই ব্যক্তির শরীরের তাপমাত্রা ৯৮.৬ ডিগ্রী ফারেনহাইটের উপরে হয়, তবে তিনি সেই ব্যক্তির জ্বর হয়েছে বলে চিহ্নিত করেন। এ ক্ষেত্রে, তাপমাত্রা চলকটি অনুপাতমূলক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ব্যাপ্তিমূলক-এ পরিণত হয়। একটি চলককে দু'টি

মাত্রায় পরিমাপ করা সম্ভব বলে অনেক সময় ব্যাপ্তিমূলক ও অনুপাতমূলক পরিমাপের মাত্রা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু তা পদ্ধতিগতভাবে সঠিক নয়।

অনুপাতমূলক মাত্রার পরিমাপ (যা সাধারণতঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই বেশী প্রয়োগ করা হয়ে থাকে) অর্জিত হয় তখনই, যখন চারটি বৈশিষ্ট্যই একটি চলকের মধ্যে থাকে। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো: (ক) সমার্থকতা (equivalence), (খ) বৃহত্তর-ক্ষুদ্রতর (greater than-less than), (গ) যে কোন দু'টি ব্যবধানের জ্ঞাত দূরত্ব (known distance of any two intervals), এবং (ঘ) একটি সত্যিকার শূন্যস্থল বা উৎপত্তিস্থল (a true zero point or origin)। তবে এটি সত্য যে, সকল বৈশিষ্ট্যই শূন্য থেকে পরিমাপ করা যায় না। যেমন, শূন্য সামাজিক শ্রেণী কোন অর্থবহ প্রত্যয় হতে পারে না। অন্যদিকে, শূন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা আমাদের স্পষ্ট ধারণা দেয় যে, একজন ব্যক্তির কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই।

অনুপাতমূলক মাত্রার পরিমাপ অর্জিত হয় তখনই, যখন চারটি বৈশিষ্ট্যই একটি চলকের মধ্যে থাকে।

পরিমাপের মাত্রাগুলোর মধ্যে তুলনা (Comparison between the Levels of Measurement)

পরিমাপ পদ্ধতির প্রধান চারটি মাত্রার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনায় সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় যে,

- নামসূচক মাত্রায় আমরা কেবল সমার্থকতা স্থাপন করতে পারি।
- ক্রমসূচক মাত্রায় সমার্থকতার পাশাপাশি বৃহত্তর-ক্ষুদ্রতর গুণগত ক্রমধারার সম্পর্ক স্থাপিত হয়।
- ব্যাপ্তিমূলক মাত্রায় সমার্থকতা ও গুণগত ক্রমধারার সম্পর্কের সাথে একটি একক থেকে অন্য এককের মধ্যে ব্যবধানের দূরত্বটি নির্ধারণ করা যায়, যা সবসময় সমান দূরত্বের হয়ে থাকে।
- অনুপাতমূলক মাত্রায় সমার্থকতা, গুণগত ক্রমধারার সম্পর্ক ও এককসমূহের মধ্যেকার ব্যবধানের জ্ঞাত দূরত্ব ছাড়াও একটি সুনির্দিষ্ট, স্বাভাবিক ও নিরঙ্কুশ উৎপত্তিস্থল নির্ণয় সম্ভব, যার গণনা শূন্য থেকে শুরু হয়।

নিচের সারণিটি পর্যবেক্ষণ করলে চারটি মাত্রার তুলনা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

পরিমাপের মাত্রা	*পর্যবেক্ষণের তুলনার উপায়*	*উদাহরণ*
নামসূচক	• পর্যবেক্ষণগুলো কি ভিন্ন?	বৈবাহিক মর্যাদা
ক্রমসূচক	• পর্যবেক্ষণগুলো কি ভিন্ন? • কোন পর্যবেক্ষণটি বৃহত্তর?	সামাজিক শ্রেণী
ব্যাপ্তিমূলক	• পর্যবেক্ষণগুলো কি ভিন্ন? • কোন পর্যবেক্ষণটি বৃহত্তর? • কতটুকু বৃহত্তর?	বয়স
অনুপাতমূলক	• পর্যবেক্ষণগুলো কি ভিন্ন? • কোন পর্যবেক্ষণটি বৃহত্তর? • কতটুকু বৃহত্তর ? • পর্যবেক্ষণটির কি একটি সুনির্দিষ্ট/ নিরঙ্কুশ শূন্য উৎপত্তিস্থল রয়েছে?	তাপমাত্রা

সবশেষে বলা যায় যে, পরিমাপের মাত্রাটি নির্ধারিত হয় চলকের প্রকৃতির উপর। অতএব, পরিমাপের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করার পূর্বে চলকের প্রকৃতিকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে।

সারাংশ

পূর্বের পাঠে আমরা নামসূচক এবং ক্রমসূচক পরিমাপ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। বর্তমানে পাঠে নামসূচক ও ক্রমসূচক মাত্রার চেয়ে উন্নততর দু'টি পরিমাপ — ব্যাপ্তিমূলক এবং অনুপাতমূলক — সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যাপ্তিমূলক পরিমাপের ক্ষেত্রে, উপাত্তের শ্রেণীবদ্ধকরণ এবং গুণগত ক্রমধারায় সম্পর্ক স্থাপনের পাশাপাশি, একটি পর্যবেক্ষণ থেকে অন্য পর্যবেক্ষণের দূরত্ব কত এককের ব্যবধানে অবস্থান করে, তা পরিমাপ করা সম্ভব। অন্যদিকে, যে চলকের স্বাভাবিক ও সুনির্দিষ্ট শূন্য অবস্থান রয়েছে, তা পরিমাপ করার জন্য অনুপাতমূলক পরিমাপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন –

১। একটি পর্যবেক্ষণ থেকে আরেকটি পর্যবেক্ষণের ব্যবধান নির্ণয়ে:

ক. নামসূচক পরিমাপ যথাযথ ফল দেয়
খ. ক্রমসূচক পরিমাপ যথাযথ ফল দেয়
গ. ব্যপ্তিসূচক পরিমাপ যথাযথ ফল দেয়
ঘ. উপরের সব।

২। _____ মাত্রার সীমাবদ্ধতাটি হলো যে, পরিমাপকৃত চলকগুলোর সুনির্দিষ্ট কোন সূচনাস্থল নেই।

ক. নামসূচক
খ. ক্রমসূচক
গ. ব্যাপ্তিমূলক
ঘ. উপরের সব

৩। যে সব চলকের নিরঙ্কুশ শূন্য অবস্থান রয়েছে, সে সব চলককে _____ মাত্রায় পরিমাপ করা যায়।

ক. নামসূচক
খ. ক্রমসূচক
গ. ব্যাপ্তিমূলক
ঘ. অনুপাতমূলক

৪। পরিমাপের মাত্রাটি নির্ধারিত হয় চলকের:

ক. সংখ্যার উপর
খ. অবস্থানের উপর
গ. আয়তনের উপর
ঘ. প্রকৃতির উপর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ব্যাপ্তিমূলক পরিমাপ কী?

২। অনুপাতমূলক পরিমাপ কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ব্যাপ্তিমূলক এবং অনুপাতমূলক পরিমাপের ব্যবহার উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

২। সমাজ গবেষণায় ব্যবহৃত পরিমাপের মাত্রাগুলোর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করুন।

পাঠ - ৪

পরিমাপের নির্ভরযোগ্যতা
Reliability of Measurement

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- পরিমাপের ভ্রান্তি
- পরিমাপের হাতিয়ারে ভ্রান্তির উৎস
- নির্ভরযোগ্যতা কি
- নির্ভরযোগ্যতা প্রাক্কলনের পদ্ধতি

পরিমাপের ভ্রান্তি (Errors of Measurement)

পরিমাপের মাধ্যমে প্রাপ্ত মানগুলোর মধ্যে প্রকৃত বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য ছাড়া অন্য যে সব পার্থক্য দেখা যায়, সেগুলোকে পরিমাপের ভ্রান্তি বলে।

প্রতিটি পরিমাপের মধ্যে দু'টি উপাদান রয়েছে – একটি প্রকৃত বৈশিষ্ট্যগত উপাদান এবং অন্যটি ভ্রান্তির উপাদান। যে কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতি সংখ্যানির্দেশক প্রতীক, সংখ্যা বা মান বরাদ্দের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা পরিমাপ পদ্ধতির ব্যবহার করেন। মান বরাদ্দ হয়ে গেলে সেই মানের মধ্যে যে ভিন্নতা তৈরি হয়, তা দুটো উৎস থেকে উদ্ভূত হয় — একটি হলো, যে বৈশিষ্ট্যকে পরিমাপ করা হয়, তার মধ্যে প্রকৃত পার্থক্যের দ্বারা সৃষ্ট ভ্রান্তি এবং অপরটি হলো, পরিমাপের হাতিয়ার থেকে, বা যে প্রেক্ষাপটে বৈশিষ্ট্যটিকে পরিমাপ করা হয়, তা থেকে সৃষ্ট ভ্রান্তি। বিশুদ্ধ পরিমাপগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যেকার প্রকৃত ভিন্নতাকে প্রকাশ করে। কিন্তু পরিমাপগুলো কদাচিৎ বিশুদ্ধ হয়ে থাকে। সেগুলো শুধু প্রকৃত পার্থক্যকেই প্রদর্শন করে না, কৃত্রিম পার্থক্যকেও নির্দেশ করে। পরিমাপের মাধ্যমে প্রাপ্ত মানগুলোর মধ্যে প্রকৃত বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য ছাড়া অন্য যে সব পার্থক্য দেখা যায়, সেগুলোকে পরিমাপের ভ্রান্তি বলে।

পরিমাপের ভ্রান্তির বহু উৎস রয়েছে। এ সকল উৎস থেকে যে ভ্রান্তিগুলো জন্ম নেয়, সেগুলো হয় 'নিয়মতান্ত্রিক', নতুবা 'দৈব' প্রকৃতির হয়ে থাকে।

পরিমাপের ভ্রান্তির বহু উৎস রয়েছে। এ সকল উৎস থেকে যে ভ্রান্তিগুলো জন্ম নেয়, সেগুলো হয় 'নিয়মতান্ত্রিক' (systematic), নতুবা 'দৈব' (random) প্রকৃতির হয়ে থাকে। যখনই পরিমাপের হাতিয়ারটি প্রয়োগ করা হয়, তখনই নিয়মতান্ত্রিক ভ্রান্তির জন্ম হয় এবং এই ভ্রান্তিগুলো গবেষণা ও ব্যক্তিভেদে স্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে। সেগুলো উপাত্তের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে অসঙ্গতির জন্ম দেয়। নিয়মতান্ত্রিক ভ্রান্তি সঙ্গতিপূর্ণভাবে একটি সাধারণ রূপ নিয়ে থাকে। দৈব ভ্রান্তি পরিমাপের হাতিয়ারের প্রতিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে পরিমাপটিকে প্রভাবিত করে। যেমন, একজন উত্তরদাতা প্রশ্নমালার একটি প্রশ্ন ভুলভাবে পড়তে পারেন, বা একজন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী একটি প্রশ্নের উত্তর ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারেন, অথবা একজন উপাত্ত বিশ্লেষক কম্পিউটারে ভুলভাবে উপাত্ত লিপিবদ্ধ করতে পারেন। এগুলো হলো দৈব ভ্রান্তির ধরণ এবং গবেষণার যে কোন পর্যায়ে এগুলো প্রবেশ করতে পারে। তবে এসব ভ্রান্তির অধিকাংশই বিশেষ যত্ন ও সম্পাদনার মাধ্যমে শোধরানো যায়। এরপরও যেগুলো রয়ে যায়, সেগুলো দৈব প্রকৃতির কারণে একে অপরকে বাতিল করে দেয় বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু দৈব ভ্রান্তির প্রধান সমস্যাটি হলো যে, এগুলো সূক্ষ্মতাকে দূর্বল করে দেয়। এগুলো চলকের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণে বিভ্রান্তিকর ফলাফল প্রদান করতে পারে।

দৈব ভ্রান্তির প্রধান সমস্যাটি হলো যে, এগুলো সূক্ষ্মতাকে দূর্বল করে দেয়। এগুলো চলকের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণে বিভ্রান্তিকর ফলাফল প্রদান করতে পারে।

নিয়মতান্ত্রিক ভ্রান্তি দৈব ভ্রান্তির মত একে অপরকে বাতিল করে না। নিয়মতান্ত্রিক ভ্রান্তি দৈব ভ্রান্তির চেয়ে বেশী বিপজ্জনক। কারণ, এগুলো অধিকতর বিভ্রান্তিকর ফলাফলের জন্ম দেয়।

নিয়মতান্ত্রিক ভ্রান্তি দৈব ভ্রান্তির মত একে অপরকে বাতিল করে না। নিয়মতান্ত্রিক ভ্রান্তি দৈব ভ্রান্তির চেয়ে বেশী বিপজ্জনক। কারণ, এগুলো অধিকতর বিভ্রান্তিকর ফলাফলের জন্ম দেয়। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। যেমন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনে অপরাধের মাত্রার হার সবসময় কম বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে, স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনে অপরাধের মাত্রার হার সবসময় বেশী হয়। কারণ, অপরাধের শিকার হয়েছেন, এমন বহু ব্যক্তি জানাজানি হয়ে যাবার ভয়ে, বা ভোগান্তি হতে পারে মনে করে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছে সাহায্যের জন্য যান না। অথচ, গবেষকের কাছে তা স্বীকার করেন গোপনীয়তা রক্ষার শর্তে। বহু

ব্যক্তিগত ও পরিবারিক অপরাধ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছে অভিযোগ করা হয় না। অপরাধের এই লুকায়িত ঘটনাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধ সম্পর্কিত পরিসংখ্যানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না। এর ফলে, একটি সমাজে অপরাধের মাত্রা সম্পর্কে ভুল ধারণার জন্ম হয় এবং অপরাধ দমনে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এ ধরণের ভ্রান্তিকে নিয়ে গবেষক বেশ উদ্বিগ্ন থাকেন। তবে, এ সকল ভ্রান্তি হ্রাসের জন্যে বিভিন্ন কৌশল রয়েছে, যা গবেষক বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করে থাকেন।

পরিমাপের হাতিয়ারে ভ্রান্তির উৎস (Sources of Errors in Measuring Instrument)

একটি আদর্শ পরিমাপের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলো হলো প্রাসঙ্গিকতা, নির্ভরযোগ্যতা, যথার্থতা ও সংবেদনশীলতা।

একটি আদর্শ পরিমাপের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলো হলো, প্রাসঙ্গিকতা, নির্ভরযোগ্যতা, যথার্থতা ও সংবেদনশীলতা। সামাজিক বিজ্ঞানে, প্রকৃতপক্ষে খুব কম পরিমাপ পদ্ধতি রয়েছে, যা এ সকল বৈশিষ্ট্য বা মানদন্ড পূরণে সমর্থ হয়। কারণ, মানুষের আচরণ, অনুভূতি, ক্ষমতা, এমন কি, দৈহিক বৈশিষ্ট্যও সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়। অতএব, কোন পরিমাপের হাতিয়ারই একটি প্রয়োগ থেকে অন্য প্রয়োগে একই রকম ফলাফল প্রদান করবে না। অন্য কথায়, চলককে পরিমাপের জন্য সামাজিক বিজ্ঞানীরা যে সকল কৌশল প্রয়োগ করেন, সেগুলোর একশ' ভাগ সঙ্গতিপূর্ণ ফলাফল অর্জনের সম্ভাবনা নেই। যেমন, দক্ষতা নিরূপণের পরীক্ষায় ব্যক্তির দক্ষতার মাত্রাই যে কেবল নির্ধারক ভূমিকা পালন করে তা নয়, পরীক্ষা গ্রহণের সময় ব্যক্তি কতটুকু সতর্ক, ক্লান্ত, বিরক্ত, সহযোগিতামূলক, বা পরীক্ষার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার কতটুকু অভিজ্ঞতা রয়েছে, এর সবই দক্ষতা নিরূপণের পরীক্ষায় প্রভাব বিস্তার করে থাকে। প্রায় সকল ক্ষেত্রে, একটি পরিমাপের হাতিয়ার কোন না কোন মাত্রায় অনির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে। উপরন্তু, কোন হাতিয়ারই নিরঙ্কুশভাবে যথার্থ নয়। পরিমাপের ফলাফল শুধু যে পরিমাপকৃত বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফলিত করে তা নয়, অন্যান্য জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত উপাদান পরিমাপকৃত বৈশিষ্ট্যকে এবং পরিমাপের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। নিম্নে এমন কিছু সম্ভাব্য ভ্রান্তির উৎসের উল্লেখ করা হলো।

প্রথমতঃ, যে বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা হয়, সেগুলোর মধ্যে প্রকৃত ভিন্নতার ফলে ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্ম হয়। যেমন, ধর্ম, গর্ভপাত, ইত্যাদির মত বিষয়ের প্রতি দু'জন মানুষের ভিন্ন মনোভাব ভিন্ন মানের জন্ম দেবে। *দ্বিতীয়তঃ*, পরিমাপের হাতিয়ার প্রয়োগের পর যে মানগুলো পাওয়া যায়, সেগুলো এমন কোন সহযোগী বৈশিষ্ট্যের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা গবেষক পরিমাপ করতে চান না। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে পার্থক্যের ফলে ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্ম হয়। বুদ্ধিমত্তা, বুদ্ধনাঙ্ক, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, সামাজিক মর্যাদা, ইত্যাদির মত বৈশিষ্ট্যগুলো প্রায়শঃ গবেষকের পর্যবেক্ষণকে প্রভাবিত করে। যেমন, নৈতিকতা বিকাশের পরিমাপ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য উত্তরদাতার একটি নির্দিষ্ট মাত্রার বুদ্ধিমত্তা ও সামাজিক সচেতনতার প্রয়োজন হতে পারে। এ প্রশ্নের উত্তর প্রকৃতপক্ষে নৈতিকতা বিকাশের পাশাপাশি, বুদ্ধিমত্তা ও সামাজিক সচেতনতার মত সহযোগী বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্যের প্রভাবকেও প্রতিফলিত করবে। এই সহযোগী উপাদানের প্রভাবের ফলে পরিমাপের ভ্রান্তি হয়। *তৃতীয়তঃ*, স্বাস্থ্য, ক্লান্তি, মেজাজ, মানসিক অবস্থার মত ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তিগত উপাদানের মধ্যে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ভিন্নতা ও পরিবর্তনের কারণে ফলাফলে ভিন্ন মানের জন্ম দেয়। *চতুর্থতঃ*, পরিস্থিতিগত কারণে ভিন্নতার সৃষ্টি হয়, যা পরিমাপের ভ্রান্তির জন্ম দেয়। যেমন, স্বামী বা শ্বাশুড়ীর সামনে একজন গৃহবধুর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলে, সে ক্ষেত্রে প্রকৃত মান পাওয়া সম্ভব হয় না। এমন কি, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর বয়স, লিঙ্গ, বেশ-ভূষা, ইত্যাদি সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর উত্তরকে প্রভাবিত করার মধ্য দিয়ে ভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। *পঞ্চমতঃ*, পরিমাপের হাতিয়ার প্রয়োগ পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে ভিন্ন মান পাওয়া যায়। *ষষ্ঠতঃ*, নমুনায়ন পদ্ধতির কারণে ভিন্নতা তৈরি হয়। যেমন, যদি একটি সমরূপ জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে নমুনা নির্বাচন করা হয়, তবে ভিন্নতা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা পাওয়া যাবে না, নমুনাটি পক্ষপাতদুষ্ট হবে। *সপ্তমতঃ*, পরিমাপের হাতিয়ারের অস্পষ্টতা ও ভিন্ন ব্যাখ্যার কারণে ভ্রান্ত মান পাওয়া যেতে পারে। যেমন, বৈবাহিক মর্যাদার বিষয়টি অস্পষ্ট হলে, ভুল উত্তর পাওয়া যেতে পারে। *অষ্টমতঃ*, পরিমাপের হাতিয়ারটি প্রয়োগের সময় যে কোন ধরণের অস্বাভাবিকতা বা যান্ত্রিক সমস্যার ফলে পরিমাপের ভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। যেমন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় টেপ রেকর্ডারের ব্যাটারী কমে গেলে উত্তরদাতার বক্তব্য

অস্পষ্টভাবে রেকর্ডকৃত হতে পারে এবং তা পরবর্তীতে ভুল মানের জন্ম দেবে। *নবমতঃ*, পরিমাপের হাতিয়ারের কাঠামোগত ভিন্নতার ফলে ভিন্ন মান পাওয়া যেতে পারে। *দশমতঃ*, উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ বা বিশ্লেষণের সময় ভ্রান্তি হলে ভিন্ন মান পাওয়া যাবে। যেমন, কম্পিউটারে উপাত্ত প্রবেশের সময় ভুল সারিতে উপাত্ত উপস্থাপন করলে সঠিক মান পাওয়া যাবে না।

নির্ভরযোগ্যতা কী (What is Reliability)?

একটি পরিমাপকে একই পরিস্থিতিতে, বা ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন গবেষকদের দ্বারা বার বার প্রয়োগ করার পর যদি পূর্বাপর একই রকম ফলাফল পাওয়া যায়, তবে বলা যাবে যে, পরিমাপটি নির্ভরযোগ্য।

সাধারণভাবে, নির্ভরযোগ্যতা বলতে একটি পরিমাপের হাতিয়ারের সঙ্গতিপূর্ণ ফল প্রকাশের ক্ষমতাকে বোঝায়। অর্থাৎ, একটি পরিমাপকে একই পরিস্থিতিতে, বা ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন গবেষকদের দ্বারা বার বার প্রয়োগ করার পর যদি পূর্বাপর একই রকম ফলাফল পাওয়া যায়, তবে বলা যাবে যে, পরিমাপটি নির্ভরযোগ্য। যদি ভিন্ন ভিন্ন ফল দেয়, তবে বোঝা যাবে যে, পরিমাপটি নির্ভরযোগ্য নয়। নির্ভরযোগ্যতাকে সঙ্গতিপূর্ণতার সাথে সমার্থক করা হয়। কারণ, নির্ভরযোগ্যতা সূক্ষ্মতা ও বস্তুনিষ্ঠতার দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। সূক্ষ্মতা ও বস্তুনিষ্ঠতা ছাড়া নির্ভরযোগ্যতা অর্জন করা যায় না। বিপরীতভাবে বলা যায় যে, একটি পরিমাপের হাতিয়ারের মধ্যে যে পরিমাণ পরিমাপজনিত ভ্রান্তি রয়েছে, তার মাত্রাটি হলো নির্ভরযোগ্যতা। একটি পর্যবেক্ষণ থেকে আরেকটি পর্যবেক্ষণে ভ্রান্তির পরিমাণ পরিবর্তিত হয় বলে এই পরিমাপজনিত ভ্রান্তিকে পরিবর্তনশীল ভ্রান্তি (variable errors) বলে অভিহিত করা হয়।

একটি সহজবোধ্য উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করা যাক। ধরা যাক, একটি স্কেল দিয়ে মেপে একটি কাগজ কাটা হলো এবং কাটার পর আবার কাগজটি ঐ স্কেল দিয়ে মাপা হলো। কিন্তু দ্বিতীয়বার মাপার পর দেখা গেল যে, প্রথমবার কাগজটির যে দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হয়েছিলো, দ্বিতীয়বার তার চেয়ে কম হয়েছে। তৃতীয়বার মাপার পর দেখা গেল যে, দৈর্ঘ্যটি এবার বেড়ে গিয়েছে। যখন এ ধরণের ভিন্নতা দেখা দেয়, তখন যে স্কেলটি দিয়ে কাগজ মাপা হয়েছিলো, সেই স্কেলটির নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয় এবং ধারণা করা হয় যে, স্কেলটির মধ্যে পরিমাপজনিত ভ্রান্তি বা পরিবর্তনশীল ভ্রান্তি রয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানে, যেহেতু অধিকাংশ প্রত্যয়কে পরোক্ষভাবে পরিমাপ করা হয়, সেহেতু সামাজিক চলকগুলো পরিমাপের সময় যে ভ্রান্তি হয়, তা প্রাকৃতিক বা ভৌত চলকগুলো পরিমাপের ফলে সৃষ্ট ভ্রান্তির চেয়ে বেশী হয়ে থাকে। যেমন, একটি প্রশ্নমালা পূরণের সময় ক্ষণিকের অন্যমনস্কতা, অস্পষ্ট নির্দেশাবলী এবং প্রযুক্তিগত বা কলাকৌশলগত সমস্যা বিভিন্ন ধরণের পরিমাপজনিত ভ্রান্তির জন্ম দিতে পারে। ফলে, পুরোপুরি যথার্থ হওয়া সত্ত্বেও একটি পরিমাপের হাতিয়ারের নির্ভরযোগ্যতার মাত্রা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে।

একটি পরিমাপ পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতার মূল্যায়নটি হলো মূলতঃ ক্ষণস্থায়ী উপাদানের প্রভাবের ফলে প্রাপ্ত ফলাফলের মানের মধ্যে কতটুকু ভিন্নতা তৈরি করে তার প্রাক্কলন।

একটি পরিমাপের হাতিয়ার তখনই নির্ভরযোগ্য বলে পরিগণিত হবে, যখন পুনঃপুন প্রয়োগের ফলে একই ফলাফল দেবে। তবে এটি মনে রাখা প্রযোজন যে, সঙ্গতিপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য ফলাফল মানেই সবসময় যথার্থ হবে, এমন কোন কথা নেই। যেমন, একটি কাপড় মাপার ফিতা সর্বোচ্চ পরিমাণে নির্ভরযোগ্য হতে পারে, কিন্তু সেটির এককগুলো যদি ভুলভাবে অঙ্কিত হয়, তবে তা কখনোই যথার্থ পরিমাপ দেবে না। অর্থাৎ, একটি কাপড়কে যতবার মাপা যাবে, ততবারই তা একই পরিমাপ দেবে, কিন্তু তা কখনই সঠিকভাবে পরিমাপটিকে প্রতিফলিত করবে না। একটি পরিমাপ পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতার মূল্যায়নটি হলো মূলতঃ, ক্ষণস্থায়ী উপাদানের প্রভাবের ফলে প্রাপ্ত ফলাফলের মানের মধ্যে কতটুকু ভিন্নতা তৈরি করে, তার প্রাক্কলন। অন্য কথায়, ভিন্নতার কতটুকু দৈব ভ্রান্তির কারণে ঘটে থাকে, তার মাত্রাই হলো নির্ভরয়োগ্যতা। পরিমাপের হাতিয়ারের মাধ্যমে প্রাপ্ত মানের মধ্যে এই দৈব ভ্রান্তির পরিমাণ যত কম হবে, হাতিয়ারটি তত নির্ভরযোগ্য বলে পরিগণিত হবে এবং ফলাফলগুলো তত বেশী সঙ্গতিপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য হবে। এর মাধ্যমে যে অন্তর্নিহিত বিষয়টি প্রতিভাত হয়, সেটি হলো যে, যেহেতু একটি হাতিয়ার নিয়মতান্ত্রিক পক্ষপাতিত্ব দ্বারা দুষ্ট হয়, সেহেতু এটি অযথার্থও হতে পারে।

নির্ভরযোগ্যতা প্রাক্কলনের পদ্ধতি (Methods of Estimating Reliability)

নির্ভরযোগ্যতা প্রত্যয়টিকে খুব সহজ এবং স্পষ্ট বলে মনে হয়। কারণ, নির্ভরযোগ্যতার কথা ভাবলে সঙ্গতিপূর্ণতা, শুদ্ধতা, সূক্ষ্মতা, ইত্যাদি শব্দগুলো মনের মধ্যে ভেসে উঠে। এর অন্তর্নিহিত অর্থের কথা ভাবলে, একই পরিমাপের দু'টি প্রয়োগ, অথবা তুলনামূলক পরিস্থিতিতে একই রকম দুই বা ততোধিক পরিমাপের প্রয়োগের ফলে একই ফলাফল প্রদানের মাত্রার কথা মনে হয়। নির্ভরযোগ্যতার বিষয়টি আসলে সেটিই এবং একটি আদর্শ পরিমাপের হাতিয়ারের নিরঙ্কুশ নির্ভরযোগ্যতা থাকে। কিন্তু এই শব্দটিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে বলে বাস্তবে নির্ভরযোগ্যতার বিষয়টি ততটা সহজ এবং স্পষ্ট নয়।

নির্ভরযোগ্যতার যে দিকগুলো সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেগুলো হলো স্থায়িত্ব সমার্থকতা ও সমরূপতা।

নির্ভরযোগ্যতার যে দিকগুলো সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেগুলো হলো স্থায়িত্ব (stability), সমার্থকতা (equivalence) ও সমরূপতা (homogeneity)। একটি পরিমাপের হাতিয়ারের ফলাফলের স্থায়িত্ব নির্ধারিত হয় পুনঃপুন প্রয়োগের ভিত্তিতে। যে বৈশিষ্ট্যকে পরিমাপ করা হয়, তার উঠানামা বা পরিস্থিতিজনিত বা ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তিগত উপাদানের মধ্যে ভিন্নতার ফলে সৃষ্ট পরিবর্তনের মাত্রার সাথে পরিমাপের হাতিয়ারের স্থায়িত্বের বিষয়টি জড়িত। যেহেতু প্রতিটি পরিমাপের দু'টি উপাদান রয়েছে (প্রকৃত বৈশিষ্ট্যগত উপাদান ও ভ্রান্তির উপাদান), সেহেতু পরিমাপকৃত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রকৃত পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অসঙ্গতি এবং বহিস্থ উপাদানের মধ্যে পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অসঙ্গতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা উচিৎ। পরিমাপকৃত বৈশিষ্ট্যটি পরিমাপের হাতিয়ারের একটি প্রয়োগ থেকে অন্য প্রয়োগে ভিন্ন হতে পারে। সামাজিক বিজ্ঞানে যে সকল প্রপঞ্চ নিয়ে আলোচনা করা হয়, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ধরণের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এ ধরণের অসঙ্গতিকে পরিমাপের হাতিয়ারের অনির্ভরযোগ্যতা বলে ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না। কিন্তু এটিও মনে রাখা প্রয়োজন যে, পরিমাপের স্থায়ীত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে, এ ধরণের অসঙ্গতি জটিলতার সৃষ্টি করে।

পরিমাপের একটি বিশেষ হাতিয়ার বিভিন্ন গবেষকের দ্বারা একই ব্যক্তির উপর একই সময়ে প্রয়োগ, বা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপের হাতিয়ার একই ব্যক্তির উপর একই সময়ে প্রয়োগের ফলে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ ফলাফল প্রদান করে, তার মাত্রার সাথে সমার্থকতার বিষয়টি জড়িত।

পরিমাপের একটি বিশেষ হাতিয়ার বিভিন্ন গবেষকের দ্বারা একই ব্যক্তির উপর একই সময়ে প্রয়োগ, বা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপের হাতিয়ার একই ব্যক্তির উপর একই সময়ে প্রয়োগের ফলে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ ফলাফল প্রদান করে, তার মাত্রার সাথে সমার্থকতার বিষয়টি জড়িত। যেহেতু একই হাতিয়ার, বা একই রকম ভিন্ন ভিন্ন হাতিয়ার বিভিন্ন গবেষকের দ্বারা একই সময়ে প্রয়োগ করা হয়, সেহেতু ভিন্নতার মাত্রাকে প্রাক্কলনের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষক পরিমাপের হাতিয়ারের প্রয়োগকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সে সব পর্যবেক্ষণের ফলাফলের ভিত্তিতে বিভিন্ন পর্যবেক্ষকের মধ্যে সমতার মাত্রা নিরূপণ করেন। সমার্থকতা ধারণার মূল শর্তটি হলো যে, যদি প্রত্যেকে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়, তবে একটি পরিমাপের হাতিয়ার একজন প্রয়োগকারী থেকে আরেকজন প্রয়োগকারী দ্বারা গ্রহণযোগ্যভাবে তুলনামূলক ফলাফল দেবে। যথাযথ প্রশিক্ষণ ভিন্নতা সৃষ্টিকারী উৎসগুলোকে যতটুকু সম্ভব কমাতে সাহায্য করে।

সমরূপতার অর্থ হলো, একটি পরিমাপের হাতিয়ারের ব্যবহৃত সব দফাগুলোকে একই রকম হতে হবে।

সমরূপতার অর্থ হলো, একটি পরিমাপের হাতিয়ারের ব্যবহৃত সব দফাগুলোকে একই রকম হতে হবে। এ ক্ষেত্রে, যে প্রশ্নটি মূখ্য সেটি হলো যে, পরিমাপের হাতিয়ারে ব্যবহৃত দফাগুলো একটি বৈশিষ্ট্যকে কি মাত্রায় পরিমাপ করছে? অর্থাৎ, যে সব উত্তরদাতা প্রথম দফার সাথে একমত পোষণ করেছেন, তার কি পরিমাণ দ্বিতীয় দফার সাথে একমত হয়েছেন? যে সব উত্তরদাতা প্রথম দফার সাথে একমত হয়েছেন, তারা কি পরবর্তী অন্যান্য দফাগুলোর সাথেও একমত হয়েছেন? অন্য কথায়, সমরূপতার প্রশ্নটি একটি পরিমাপের নির্ভরযোগ্যতার অভ্যন্তরীণ সঙ্গতির বিষয়টিকে সম্বোধন করে।

একটি পরিমাপের হাতিয়ারের নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় যে পদ্ধতিগুলো, সেগুলো হলো পরীক্ষা-পুনঃপরীক্ষা পদ্ধতি (test-retest method), অর্ধ-বিভাজন পদ্ধতি (split-half method), আন্ত-দফা ও দফা-মাপনী পরীক্ষা (inter-item test and item-scale test), এবং বিকল্প-রূপ বা সমান্তরাল-রূপ পদ্ধতি (alternate-form or parallel-form method)। এই পদ্ধতিগুলোকে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

পরীক্ষা-পুনঃপরীক্ষা পদ্ধতিতে একই গবেষণার বিষয়ে একই পরিমাপের হাতিয়ার দিয়ে যদি পরীক্ষা ও পুনঃপরীক্ষা করা হয় এবং প্রতিবার একই ফলাফল পাওয়া যায়, তবে পরিমাপের হাতিয়ারটিকে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে।

পরীক্ষা-পুনঃপরীক্ষা পদ্ধতি (Test-Retest Method): এই পদ্ধতিতে একই গবেষণার বিষয়ে একই পরিমাপের হাতিয়ার দিয়ে যদি পরীক্ষা ও পুনঃপরীক্ষা করা হয় এবং প্রতিবার একই ফলাফল পাওয়া যায়, তবে পরিমাপের হাতিয়ারটিকে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। অর্থাৎ, দু'টি ভিন্ন সময়ে একটি দলের উপর একটি নির্দিষ্ট পরিমাপের হাতিয়ার প্রয়োগ করা হয় এবং দু'টি সময়ে প্রাপ্ত মানগুলো যদি কাছাকাছি হয়, তবে পরিমাপের হাতিয়ারটিকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে দু'টি সমস্যা রয়েছে। প্রথম সমস্যাটি হলো, যে পূর্বশর্তটি অনুমান করা হয়, সেটি সবসময় কার্যকর থাকে না। অনুমিত পূর্বশর্তটি হলো, পুনঃপরীক্ষার সময় কোন মধ্যবর্তী চলক বা ঘটনার প্রভাব যেন না পড়ে। কিন্তু পুনঃপরীক্ষার সময় দেখা যায় যে, সবসময় কোন না কোন ঘটনা বা বিষয় মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যেমন, পরিমাপের হাতিয়ারটি যদি একটি প্রশ্নমালা হয়, তবে প্রথমবার প্রয়োগের পর সেটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে মানুষের পূর্ব ধারণা থাকে বলে পরবর্তী সময়ের প্রয়োগগুলোর ক্ষেত্রে, তারা আরো বেশী সচেতন হয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এতে করে নির্ভরযোগ্যতার মাত্রাটি কৃত্রিমভাবে বড় হয়ে যায়। দ্বিতীয় সমস্যাটি হলো যে, সময়ের সাথে সাথে অনেক প্রপঞ্চের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে এবং এর ফলে, নির্ভরযোগ্যতার মাত্রাটি কৃত্রিমভাবে নিম্ন হতে পারে। এমন হতে পারে যে, দ্বিতীয়বার পরিমাপের পূর্বেই চলকটির মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে, যার ফলে নির্ভরযোগ্যতার সহগের মান ছোট হয়েছে।

বিকল্প-রূপ বা সমান্তরাল-রূপ পদ্ধতিতে একটি পরিমাপের হাতিয়ারের দু'টি ধরণ প্রয়োজন, যা সমান্তরাল বা একটি অপরটির বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

বিকল্প-রূপ বা সমান্তরাল-রূপ পদ্ধতি (Alternate-form or Parallel-form Method): পরীক্ষা-পুনঃপরীক্ষা পদ্ধতির সমস্যা দু'টিকে মোকাবেলা করার জন্য নির্ভরযোগ্যতা পরিমাপের বিকল্প-রূপ বা সমান্তরাল-রূপ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে একটি পরিমাপের হাতিয়ারের দু'টি ধরণ প্রয়োজন, যা সমান্তরাল বা একটি অপরটির বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করা যায়। এ দু'টি ধরণ একদল ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা হয় এবং প্রাপ্ত মানগুলোর মধ্যে সহ-সম্পর্কের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা হয়। যেমন, একই প্রত্যয়কে পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন দফা ব্যবহার করে একজন গবেষক দু'টি ভিন্ন প্রশ্নমালা তৈরি করেন। তারপর, একই সময়ে একই দলের উপর দু'টি প্রশ্নমালা প্রয়োগ করেন এবং প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে সম্পর্কের মাত্রা পরীক্ষা করেন। যদি মাত্রাটি অনেক বড় সহগের জন্ম দেয়, তবে পরিমাপের হাতিয়ার দু'টি নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং পরীক্ষার জন্য এর যে কোন একটিকে ব্যবহার করা যাবে। এই পদ্ধতিতে বাহ্যিক বা মধ্যবর্তী উপাদানের কোন প্রভাব থাকে না এবং প্রথম পরীক্ষার প্রভাব দ্বিতীয় পরীক্ষার উপর পড়ে না। কিন্তু দু'ধরণের পরিমাপের হাতিয়ারের মধ্যে একটি আরেকটির বিকল্প বা সমান্তরাল কি না, তা নির্ধারণ করা কঠিন। পরিসংখ্যানগতভাবে, এর সমান্তরাল বা বিকল্প বৈশিষ্ট্যটি নির্ধারণ করা গেলেও ধরণগুলোর বিষয়বস্তুর মূল্যায়নটি করা হয় বিবেচনাবোধের মাধ্যমে।

আন্ত-দফা ও দফা-মাপনী পরীক্ষা পদ্ধতি (Inter-item and Item-Scale Test Method): এই পদ্ধতিতে দফাগুলোর মধ্যে সম্পর্ক দেখা হয় বা দফা-মাপনীর সহ-সম্পর্ক দেখা হয়। এই সহ-সম্পর্কের মাত্রাটি পরিমাপের নির্ভরশীলতার মাত্রাকে নির্দেশ করে।

অর্ধ-বিভাজন পদ্ধতি (Split-half Method): এই পদ্ধতিতে যে সকল দফাগুলো পরিমাপের হাতিয়ার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, সে সকল দফাকে সমান দু'ভাগে ভাগ করা হয়। এক ভাগে থাকে জোড় সংখ্যক দফা এবং অন্যভাগে থাকে বিজোড় সংখ্যক দফা। দু'টি সেটের প্রতিটিকে আলাদা করে বিবেচনা করা হয় এবং দু'টি বিভাজিত অর্ধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মান বরাদ্দ করা হয়। এরপর, এই দুই সেট মানের মধ্যে সহ-সম্পর্ক দেখা হয়। যদি সহ-সম্পর্কের সহগটি ০.৯০ বা তার চেয়ে বেশী হয়, তবে বোঝা যাবে যে, পরিমাপটি নির্ভরযোগ্য। এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন দফার সংখ্যামান বরাদ্দটি নির্ভরযোগ্যতার প্রাক্কলনকে প্রভাবিত করে। যেহেতু সংখ্যাগুলো পরিবর্তিত হবার সময় দু'টি অর্ধের প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন দফার সমন্বয়ে গঠিত হয়, সেহেতু ভিন্ন সহ-সম্পর্কের সহগের মান প্রদান করে। অতএব, এর ফলে একই ব্যক্তির উপর একই দফার প্রয়োগের পরও ভিন্ন প্রাক্কলনের জন্ম নেবে। এই সমস্যা এড়ানোর জন্য বিভাজনের প্রয়োজন হয় না, এমন পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিৎ।

সারাংশ

এই পাঠে আমরা পরিমাপের ভ্রান্তি, পরিমাপের হাতিয়ারে ভ্রান্তির উৎস, নির্ভরযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতার প্রাক্কলনের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা জেনেছি যে, যথাযথ পরিমাপ গবেষণার পূর্ব শর্ত। কিন্তু এই পরিমাপ করতে গিয়ে গবেষককে বিভিন্ন ধরণের ভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়। এই ভ্রান্তি দুর করতে গবেষককে যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করতে হয়, সেগুলো হলো, পরীক্ষা-পুনঃপরীক্ষা পদ্ধতি, অর্ধ-বিভাজন পদ্ধতি, আন্ত-দফা ও দফা-মাপনী পরীক্ষা এবং বিকল্প-রূপ বা সমান্তরাল-রূপ পদ্ধতি। কোন পদ্ধতিটি যথাযথ হবে, তা গবেষণার ধরণ, সমস্যার প্রকৃতি, ভ্রান্তির মাত্রা ও রূপের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ, উপাত্তের গুণগত মান এবং তথ্য সংগ্রহের কৌশলের যথার্থতা পরিমাপের উদ্দেশ্যে নির্ভরযোগ্যতা পরিমাপ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন –

১। উত্তরদাতা প্রশ্নমালার একটি প্রশ্ন ভুলভাবে পড়ে উত্তর দিলে, তা হবে:

ক. নিয়মতান্ত্রিক ভ্রান্তি
খ. দৈব ভ্রান্তি
গ. সচেতন ভ্রান্তি
ঘ. উপরের সব।

২। পরিমাপের সত্যিকারের অবস্থানের সাথে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের সঙ্গতিপূর্ণ হবার মাত্রাকে পরিমাপের:

ক. নির্ভরশীলতা বলে
খ. যথাযথতা বলে
গ. যথার্থতা বলে
ঘ. ভ্রান্তি বলে।

৩। পরিমাপের হাতিয়ার তখনই নির্ভরযোগ্য হবে:

ক. যখন প্রয়োগের ফলে সর্বোচ্চ ফল প্রদান করবে
খ. যখন পুনঃপুন প্রয়োগের ফলে নিরঙ্কুশ ফল দেবে
গ. যখন পুনঃপুন প্রয়োগের ফলে একই ফলাফল দেবে
ঘ. উপরের সব।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। পরিমাপের ভ্রান্তি কী?

২। নির্ভরযোগ্যতা কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পরিমাপের ভ্রান্তি কী? পরিমাপের হাতিয়ারে ভ্রান্তির উৎস আলোচনা করুন।

২। নির্ভরযোগ্যতা প্রাক্কলনের পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করুন।

পাঠ - ৫

পরিমাপের যথার্থতা
Validity of Measurement

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- যথার্থতা কী
- যথার্থতা নিরূপণের পদ্ধতি

যথার্থতা কী (What is Validity)?

যথার্থতার অর্থ হলো, তত্ত্বগত বা প্রত্যয়গত মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ফলাফল বা প্রত্যয়গুলো প্রকৃত অর্থের সাথে মিলে যায়, এমন ফলাফল উৎপাদনের ক্ষমতা।

একজন গবেষক কোন বস্তু বা ব্যক্তির যে বৈশিষ্ট্যকে পরিমাপ করতে চান, তার সত্যিকার অবস্থানের সাথে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের সঙ্গতিপূর্ণ হবার মাত্রাকে পরিমাপের যথার্থতা বলে। অন্য কথায়, যথার্থতার অর্থ হলো, তত্ত্বগত বা প্রত্যয়গত মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ফলাফল বা প্রত্যয়গুলো প্রকৃত অর্থের সাথে মিলে যায়, এমন ফলাফল উৎপাদনের ক্ষমতা। একটি যথার্থ পরিমাপ যে পরিবেশ, পরিস্থিতি বা অবস্থার উপর গবেষণা করা হয়, তাকে সত্যিকারভাবে প্রতিফলিত করে সঠিক ফলাফলের জন্ম দেয়। অর্থাৎ, একজন গবেষক তার পরিমাপের হাতিয়ারের মাধ্যমে যা পরিমাপ করতে চান, সেই হাতিয়ারটি তা পরিমাপ করছে কি না যথার্থতা তার মাত্রাকে নির্দেশ করে। যেমন, যদি বলা হয় যে,'কিছু সংখ্যক মুষ্টিমেয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি যখন সমাজের সকল সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করেন, তখন একজন ক্ষমতাহীন সাধারণ মানুষ তার ভাগ্য পরিবর্তনে তেমন কিছুই করতে পারেন না'। এই বক্তব্যটির সাথে একমত হলে, তা কি বিচ্ছিন্নতাবোধের একটি সূচক হিসাবে পরিগণিত হবে? এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে গবেষককে গবেষণালব্ধ প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে, যার মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন যে, তিনি যা পরিমাপ করতে চেয়েছেন পরিমাপের হাতিয়ারটি তা পরিমাপ করেছে।

প্রত্যক্ষ পরিমাপের ক্ষেত্রে যথার্থতা হলো স্বতঃপ্রমাণিত। অর্থাৎ, পরিমাপটি কোন প্রমাণ ছাড়াই স্পষ্ট হয়ে উঠে।

প্রত্যক্ষ পরিমাপের ক্ষেত্রে যথার্থতা হলো স্বতঃপ্রমাণিত। অর্থাৎ, পরিমাপটি কোন প্রমাণ ছাড়াই স্পষ্ট হয়ে উঠে। কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানের অধিকাংশ প্রত্যয়কে পরোক্ষভাবে পরিমাপ করা হয়। পরোক্ষ পরিমাপের ক্ষেত্রে, গবেষক কখনই পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেন না যে, তিনি যা পরিমাপ করতে চান তা তিনি পরিমাপ করতে পারছেন। তিনি বস্তু বা ব্যক্তির সঠিক অবস্থানটি জানতে পারেন না বলে সংশ্লিষ্ট পরিমাপের যথার্থতাকে নির্ধারণ করার কোন প্রত্যক্ষ উপায় থাকে না। পরোক্ষ পরিমাপের মাধ্যমে কোন বিষয়ের পরিমাপ করে কেবলমাত্র বাস্তবতার সন্নিকটবর্তী হওয়া যায়। এ ধরণের পরিস্থিতিতে, একটি পরিমাপের যথার্থতা প্রমাণের জন্য আমাদের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রমাণের সাথে প্রাপ্ত ফলাফলটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তা পরখ করে নিতে হয়। প্রাসঙ্গিক প্রমাণটি কি হবে, তা নির্ভর করবে পরিমাপের হাতিয়ারটির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের উপর।

পরোক্ষ পরিমাপের মাধ্যমে কোন বিষয়ের পরিমাপ করে কেবলমাত্র বাস্তবতার সন্নিকটবর্তী হওয়া যায়।

যদি আমরা জানি যে, পরিমাপের একটি হাতিয়ার সন্তোষজনকভাবে যথার্থ, তবে পরিমাপের সেই হাতিয়ারের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা করবার কিছু থাকে না। অর্থাৎ, যদি একটি হাতিয়ার যথার্থ হয়, তবে তার অর্থ হলো যে, সেটি দিয়ে যা পরিমাপ করতে চাওয়া হয়েছে, তা করা গিয়েছে। সে ক্ষেত্রে, অন্যান্য উপাদানের (তা স্থায়ী বা অস্থায়ী যাই হোক না কেন) প্রভাবের ফলে যেটুকু ভ্রান্তির জন্ম দেয়, তাতে করে আমরা বলতে পারি যে, পরিমাপের হাতিয়ারটির একটি গ্রহণযোগ্য নির্ভরযোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু একটি পরিমাপের সন্তোষজনক যথার্থতা রয়েছে কি না, তা পূর্বে পরিচালিত গবেষণার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবার আগে গবেষকগণ খুব কমই জানতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে, যথার্থতার প্রমাণ সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত থাকে। এ রকম পরিস্থিতিতে, পরিমাপের হাতিয়ারটিকে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করে তার যথার্থতার অনুমান করতে হয়। এ ছাড়াও, একটি গবেষণায় প্রাপ্ত উচ্চ মাত্রার যথার্থতা অন্য গবেষণায় একই মাত্রায় পাওয়া যাবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। অতএব,

যথার্থতা প্রমাণের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষায় না থেকে নির্ভরযোগ্যতার মানদন্ডটি দিয়ে পরিমাপের হাতিয়ারের উপযোগিতাকে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

যথার্থতা নিরূপণের পদ্ধতি (Techniques of Ascertaining Validity)

পরিমাপের হাতিয়ারের যথার্থতা যাচাইয়ের দু'টি প্রধান পদ্ধতি রয়েছে – অভিজ্ঞতামূলক ও তত্ত্বগত যথার্থতার যাচাই।

পরিমাপের হাতিয়ারের যথার্থতা যাচাইয়ের দু'টি প্রধান পদ্ধতি রয়েছে — অভিজ্ঞতামূলক ও তত্ত্বগত যথার্থতার যাচাই। অভিজ্ঞতামূলক যথার্থতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে একটি পরিমাপের যথার্থতা নিরূপণ করা হয় অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমাণের বিপরীতে, এবং তত্ত্বগত যথার্থতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে, একটি পরিমাপের হাতিয়ারের যথার্থতা নিরূপণ করা হয় তত্ত্বগত বা প্রত্যয়গত নির্মাণ ব্যবহারের মাধ্যমে। অভিজ্ঞতামূলক যথার্থতা বাস্তবসম্মত বা মানদন্ড ভিত্তিক যথার্থতাকে (pragmatic or criterion validity) পরীক্ষা করে। এই পদ্ধতির অধীনে, সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত প্রকরণগুলো হলো সংঘটনশীল যথার্থতা (concurrent validity) ও ভবিষ্যদ্বাণীমূলক যথার্থতা (predictive validity) যাচাই পদ্ধতি। যখন অভিজ্ঞতামূলক যথার্থতা নিরূপণ করা সম্ভব হয় না, বা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে, তখন তত্ত্বগত বা প্রত্যয়গত যথার্থতা যাচাইয়ের কৌশল অবলম্বন করতে হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে যখন তত্ত্বগত বিষয়ের নীতিমালাগুলো সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তখন দাবী করা যায় যে, সংশ্লিষ্ট পরিমাপটির তত্ত্বগত বা প্রত্যয়গত যথার্থতা রয়েছে। তত্ত্বগত বা প্রত্যয়গত যথার্থতার বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন আপাতপ্রতিয়মান যথার্থতা (face validity), নমুনা বা বিষয়বস্তু যথার্থতা (sampling or content validity) ও নির্মাণ যথার্থতা (construct validity)।

সংঘটনশীল যথার্থতা (Concurrent Validity): যদি একটি পরিমাপের হাতিয়ার এমন ফলাফল প্রদান করে যে, যে সকল ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার অতিরিক্ত কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকে, তারা অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় অধিকতর ভালো ফলাফল করে এবং তা যদি বিদ্যমান উপাত্তের মাধ্যমে সমর্থিত হয়, তবে সেই হাতিয়ারটির বাস্তবসম্মত যথার্থতা রয়েছে বলে মনে করা হয়। এখানে, যথার্থতাকে যুক্ত করা হয়েছে, 'যদি বিদ্যমান উপাত্ত দ্বারা ফলাফল সমর্থিত হয়', এমন পূর্ব ধারণার সাথে। এ ধরণের অবস্থায় নিরূপিত যথার্থতাকে সংঘটনশীল যথার্থতা বলে।

প্রায়শঃ, পরিমাপের হাতিয়ারটি যে ভবিষ্যদ্বাণী করে, তা পরবর্তীতে প্রাপ্ত ফলাফলের দ্বারা কতটুকু সমর্থিত হয়, তার মাত্রার মাধ্যমে একটি পরিমাপের হাতিয়ারের যথার্থতাকে যাচাই করা হয়। যদি পরবর্তীতে প্রাপ্ত ফলাফল ভবিষ্যদ্বাণীকে সমর্থন করে, তবে পরিমাপটিকে যথার্থ বলে দাবী করা হয়।

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক যথার্থতা (Predictive Validity): প্রায়শঃ, পরিমাপের হাতিয়ারটি যে ভবিষ্যদ্বাণী করে, তা পরবর্তীতে প্রাপ্ত ফলাফলের দ্বারা কতটুকু সমর্থিত হয়, তার মাত্রার মাধ্যমে একটি পরিমাপের হাতিয়ারের যথার্থতাকে যাচাই করা হয়। যদি পরবর্তীতে প্রাপ্ত ফলাফল ভবিষ্যদ্বাণীকে সমর্থন করে, তবে পরিমাপটিকে যথার্থ বলে দাবী করা হয়। ধরা যাক, যদি কোন গবেষণায় দেখা যায় যে, সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষা কার্যক্রমে উচ্চতর পরিসংখ্যান পাঠদান শুরু করলে অধিক পরিমাণে পুরোনো ছাত্র-ছাত্রীরা কার্যক্রম ত্যাগ করবে, এবং যদি এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পরবর্তী গবেষণায় সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তবে বলা যাবে যে, পরিমাপের হাতিয়ারটি যথার্থ। এ ধরণের যথার্থতা যাচাইয়ের পদ্ধতিকে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক যথার্থতা বলে। এটিকে অনেক সময় মানদন্ডভিত্তিক যথার্থতা বলেও অভিহিত করা হয়। অন্য কথায়, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক যথার্থতা হলো একটি প্রদত্ত পরিমাপের ফলাফল ও একটি বাহ্যিক মানদন্ডের মধ্যে সহ-সম্পর্কের সহগ। যেমন, একজন গবেষক একটি বুদ্ধনাঙ্ক পরীক্ষার যথার্থতা প্রমাণ করতে পারেন একদল ছাত্র-ছাত্রীর প্রাপ্ত বুদ্ধনাঙ্ক পরীক্ষার মান এবং তাদের বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে সহ-সম্পর্কের সহগ নির্ণয়ের মাধ্যমে। এই নির্ণীত সহগকে যথার্থতার সহগ বলে। তবে এই সহ-সম্পর্কের সহগটি একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হলেও সেটি যথেষ্ট নয়। কারণ, পরিমাপের হাতিয়ারটি যে চলককে পরিমাপ করে বলে অনুমান করা হয়, সেটি আরো অন্য চলককেও পরিমাপ করতে পারে। এর ফলে, যথার্থতার পরিবর্তে অযথার্থতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক যথার্থতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে দু'টি সাধারণ বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। একটি হলো বাহ্যিক মানদন্ডটির যথার্থতার সাথে সম্পর্কিত, এবং অন্যটি হলো মানদন্ডটি ব্যবহার না করে পরিমাপের হাতিয়ার ব্যবহারের কারণ সম্পর্কিত।

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক যথার্থতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে দু'টি সাধারণ বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। একটি হলো বাহ্যিক মানদন্ডটির যথার্থতার সাথে সম্পর্কিত, এবং অন্যটি হলো মানদন্ডটি ব্যবহার না করে পরিমাপের হাতিয়ার ব্যবহারের কারণ সম্পর্কিত। দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে বলা যায় যে, মানদন্ড ব্যবহার না করে সরাসরি বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর পরিমাপ করা হয় কেন? কারণ, অনেক ক্ষেত্রে মানদন্ড

ব্যবহার কঠিন ও ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়ে, এবং কখনও কখনও মানদন্ড ব্যবহারের পূর্বেই গবেষককে চলকের পরিমাপ করতে হয়।

একটি পরিমাপের হাতিয়ারের আপাতপ্রতিয়মান যথার্থতা রয়েছে বলে ধরে নেয়া হয় যদি মনে হয় যে, পরিমাপটি যা পরিমাপ করতে চায় তা পরিমাপ করেছে।

আপাতপ্রতিয়মান যথার্থতা (Face Validity): একটি পরিমাপের হাতিয়ারের আপাতপ্রতিয়মান যথার্থতা রয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়, যদি মনে হয় যে, পরিমাপটি যা পরিমাপ করতে চায়, তা পরিমাপ করেছে। একটি উদাহরণ দেয়া যাক, ধরা যাক, একজন গবেষক দশটি প্রশ্নের একটি সেট দিয়ে উদারতাবাদ প্রত্যয়টিকে পরিমাপ করতে চান । প্রশ্নমালা তৈরির পর তিনি প্রতিটি প্রশ্নের বক্তব্যকে বার বার পর্যালোচনা করে দেখার পর নিশ্চিত হলেন যে, প্রতিটি প্রশ্ন উদারতাবাদের সাথে সম্পর্কিত হয়েছে। তারপর, সহকর্মী এবং বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনার পর যদি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, পরিমাপের হাতিয়ারটি উদারতাবাদকে পরিমাপ করেছে, তবে গবেষক ধরে নেবেন যে, প্রশ্নমালাটি আপাতদৃষ্টিতে যথার্থ বলে প্রতিয়মান হয়েছে। আপাতপ্রতিয়মান যথার্থতার সমস্যাটি হলো যে, এ কৌশলের মাধ্যমে পরিমাপটিকে পুনরায় পরিচালনা করে এর বস্তুগত মূল্যায়নের কোন পদ্ধতিগত নির্দেশনা পওয়া যায় না। আপাতপ্রতিয়মান যথার্থতা সম্পূর্ণভাবে গবেষকের ভাবগত মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে নিরূপিত হয়।

নমুনা বা বিষয়বস্তু যথার্থতা (Sampling or Content Validity): এই পদ্ধতির প্রধান বিবেচ্য বিষয়টি হলো যে, পরিমাপের জন্য প্রস্তুতকৃত হাতিয়ারটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে, প্রাসঙ্গিক জনসংখ্যা থেকে যথাযথভাবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে কি না। অর্থাৎ, পরিমাপের হাতিয়ারটি বিষয়টিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রতিনিধিত্ব করেছে কি না। এ পদ্ধতির মূল ধারণাটি হলো যে, প্রতিটি চলকের একটি বিষয়বস্তুর সমগ্রক রয়েছে, যা ব্যাপক সংখ্যক বক্তব্য, প্রশ্ন বা সূচকের সমন্বয়ে গঠিত। একটি যথার্থ পরিমাপের হাতিয়ার এই বিষয়বস্তুগুলোর যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু বাস্তবে বিষয়বস্তুর সমগ্রককে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে সমস্যার উদ্ভব ঘটে। কারণ, এটি হলো তত্ত্বগত নির্মাণ, অভিজ্ঞতালব্ধ নয়। এই সমস্যাটি নমুনা যথার্থতার কার্যকারীতাকে কিছুটা খর্বিত করে। তবে, পরিমাপের যথার্থতা নিরূপণের ক্ষেত্রে, নমুনা যথার্থতা একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে। এটি গবেষককে বিষয়বস্তুর সমগ্রকের সকল উপাদানকে পরিচিত হতে সাহায্য করে। এ ধরণের যথার্থতা যাচাইয়ের কৌশল সাধারণতঃ বর্ণনামূলক গবেষণায় বেশী ব্যবহৃত হয়। কারণ, গবেষক এর মাধ্যমে পরিমাপের হাতিয়ার নির্মাণে প্রয়াসী হন এবং তাদের প্রথমবারেব মত প্রয়োগ করেন। হাতিয়ারটি ব্যবহারের পর যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য অন্যান্য পরীক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে এটিকে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

নির্মাণ যথার্থতা (Construct Validity): গবেষকগণ প্রায়শঃ তাদের যথার্থতার পরীক্ষাকে ভবিষ্যদ্বাণীর সূচক হিসাবে বিবেচনা না করে ভবিষ্যদ্বাণীর মাত্রায় আগ্রহী হয়ে থাকেন। কারণ, তিনি মানব আচরণের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে উপসংহার টানতে চান, সেই বৈশিষ্ট্যগুলো একটি আচরণের মধ্যে পাওয়া যায় না। সেগুলো বরং বহু আচরণের বিমূর্তন বা নির্মাণ। সেই নির্মাণের ভিত্তিতে যথার্থতা যাচাইয়ের পদ্ধতিটিকে নির্মাণ যাথার্থতা বলে। নির্মাণ যথার্থতা একটি পরিমাপের হাতিয়ারকে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত করে দেখে যে, সেই হাতিয়ারটি ঐ তত্ত্বের অনুমান ও প্রত্যয়গুলোকে প্রতিফলিত করে কি না। যদি সেই সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বলা যায় যে, পরিমাপের হাতিয়ারটি নির্মাণ যথার্থতা অর্জন করেছে। যদি গবেষণার বিষয়বস্তুটি হয় ছাত্রীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, সে ক্ষেত্রে গবেষককে প্রথমে গবেষণা প্রশ্নে বিপরীতভাবে ভিন্ন মতাবলম্বী দু'দল ছাত্রকে চিহ্নিত করতে হবে। তারপর, যে পরিমাপের হাতিয়ারটির যথার্থতা প্রমাণ করতে চাই, সেটিকে দু'দলের উপরই পরিচালনা করে তাদের ফলাফলগুলো আলাদা করে লিপিবদ্ধ করতে হবে। যদি দু'টি দলের মধ্যে পার্থক্য পাওয়া যায়, তবে ধরে নিতে হবে যে, পরিমাপের হাতিয়ারটি নির্মাণ যথার্থতা অর্জন করেছে।

নির্মাণ যথার্থতা নিরূপণে গবেষক তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তিতে পরিমাপের হাতিয়ার ও চলকের মধ্যে প্রত্যাশিত সম্পর্ককে সুনির্দিষ্ট করেন। তারপর, তিনি পরিমাপের ভিত্তিতে প্রাপ্ত মানগুলোর সাথে চলকগুলোর সম্পর্ক নির্ণয় করে সেগুলোকে প্রত্যাশিত সম্পর্কের সাথে তুলনা করেন। এই তুলনার

পার্থক্যটি যদি ক্ষুদ্র হয়, তবে গবেষকের আস্থা বেড়ে যাবে এই ভেবে যে, তার পরিমাপটি নির্মাণ যথার্থতা পেয়েছে। যেমন, এটি প্রত্যাশিত যে, সামাজিক মর্যাদা, শিক্ষা, পেশা ও আয়ের সাথে ধনাত্মকভাবে সম্পর্কিত হবে এবং সন্তান সংখ্যার সাথে ঋণাত্মকভাবে সম্পর্কিত হবে। সামাজিক মর্যাদার সাথে এই চলকগুলোর মানের সহ-সম্পর্কটি যদি প্রত্যাশিত দিক ও মাত্রায় পাওয়া যায়, তবে সামাজিক মর্যাদার পরিমাপটির যথার্থতা প্রমাণিত হবে।

যথার্থতার বিভিন্ন প্রকরণগুলো আলোচনার পর স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় সেটি হলো, যথার্থতা নিরূপণের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিকে আমরা বেছে নেব? এই প্রশ্নের সহজ সমাধান নেই। এই প্রশ্নের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ দল তিনটি সুপারিশ প্রদান করেছেন। প্রথমতঃ, পরিমাপ নির্মাণের প্রথম পর্যায়ে, একজন গবেষক প্রাসঙ্গিক তত্ত্বগুলোকে পর্যালোচনা করবেন, যা পরিমাপের হাতিয়ার নির্মাণের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। দ্বিতীয়তঃ, একটি বিষয়বস্তুর সমগ্রককে সংজ্ঞায়িত করবেন, যেখান থেকে একটি প্রতিনিধিত্বশীল নমুনাকে নির্বাচন করা হবে। তৃতীয়তঃ, একটি বাহ্যিক মানদন্ডের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পরিমাপের হাতিয়ারটির ভবিষ্যদ্বাণীমূলক যথার্থতার যাচাই করবেন।

সারাংশ

মোট দু'টি বিষয়কে কেন্দ্র করে বর্তমান পাঠটি রচিত হয়েছে। বিষয় দু'টি হলো, যথার্থতা ও যথার্থতা নিরূপনের পদ্ধতি। গবেষণা প্রক্রিয়ায় উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পরিমাপ কোন প্রমাণ ছাড়াই স্পষ্ট হয়ে উঠে। অন্যদিকে, পরোক্ষ পরিমাপের মাধ্যমে বাস্তবতার সন্নিকটে পৌঁছানো সম্ভব। বস্তুতঃ, উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা পরিমাপ গবেষণার গুণগত মানকে বৃদ্ধি করে। যথার্থতা যাচাইয়ে দু'টি প্রধান পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে — অভিজ্ঞতামূলক ও তত্ত্বগত। অভিজ্ঞতামূলক যথার্থতা মানদন্ডভিত্তিক যথাযর্থতাকে পরীক্ষা করে। অন্যদিকে, তত্ত্বগত যথার্থতা তত্ত্বগত বিষয়ের নীতিমালাগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়গুলোকে পরীক্ষা করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন –

১। একটি পরিমাপের হাতিয়ারের সঙ্গতিপূর্ণ ফল প্রকাশের ক্ষমতাকে _____।

ক. যথার্থতা বলে
খ. পরিমাপের শুদ্ধতা বলে
গ. পরিমাপের নির্ভরযোগ্যতা বলে
ঘ. পরিমাপের সঠিকতা বলে

২। পরিমাপের হাতিয়ারের যথার্থতা যাচাইয়ের _____ প্রধান পদ্ধতি রয়েছে।

ক. ১টি
খ. ২টি
গ. ৩টি
ঘ. ৪টি

৩। নমুনা যথার্থতা যাচাইয়ের কৌশল সাধারণতঃ

ক. বর্ণনামূলক গবেষণায় বেশী ব্যবহৃত হয়
খ. ব্যাখ্যামূলক গবেষণায় বেশী ব্যবহৃত হয়
গ. পরিচিতিমূলক গবেষণায় বেশী ব্যবহৃত হয়
ঘ. নগর গবেষণায় বেশী ব্যবহৃত হয়।

৪। আপাতপ্রতিয়মান যথার্থতা নির্ভর করে গবেষকের:

ক. আর্থিক সঙ্গতির উপর
খ. ভাবগত মূল্যায়নের উপর
গ. গবেষণা পরিকল্পনার উপর
ঘ. গবেষণা কাজে সময় ব্যয় করার উপর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। যথার্থতা কী?

২। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক যথার্থতা কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পরিমাপের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন।

২। 'যথাযথ পরিমাপের উপর নির্ভর করে গবেষণার গুণাগুণ' – আপনি কি এই বক্তব্যর সাথে এক মত? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

পাঠ - ৬

মাপনী কৌশল
Scaling Techniques

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- মাপনী কী
- মাপনী কৌশলের প্রকারভেদ

মাপনী কী (What is Scaling)?

পরিমাপের বিভিন্ন মাত্রায় আমরা দেখেছি যে, কিছু পরিমাপ খুবই সহজ এবং একটি মাত্র দফা বা চলকের একটি মাত্র সূচকের মাধ্যমে পরিমাপ সম্পন্ন করা যায়। যেমন, একটি মাত্র প্রশ্নের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির বয়স পরিমাপ করা যায়। বৈবাহিক মর্যাদা বা সন্তান সংখ্যা জানতে হলেও একটি প্রশ্নের মাধ্যমে তা পরিমাপ করা যায়। এ সকল চলকগুলো স্পষ্ট, নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ পরিমাপ প্রদান করে। কিন্তু আমরা এও জানি যে, কিছু চলক রয়েছে, যা পরিমাপ করা বেশ কঠিন এবং জটিল। কিছু চলক রয়েছে, যা একাধিক সূচকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং কিছু চলক রয়েছে, যার একাধিক মাত্রা থাকে, যা বহু সূচকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। আবার এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যেখানে আমরা একটি চলক কি মাত্রায় উপস্থিত রয়েছে তা জানতে চাই। এ ধরণের পরিস্থিতিতে এক-দফাসম্পন্ন পরিমাপের হাতিয়ারের ব্যবহার পর্যাপ্ত নয়।

এমন কি, উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণে যথেষ্ট যত্নবান হওয়া সত্ত্বেও একটি জটিল চলককে একটি মাত্র প্রশ্নের মাধ্যমে যথোপযুক্তভাবে প্রতিনিধিত্বশীল করে পরিমাপ করা যায় না। এক দফাসম্পন্ন একটি প্রশ্ন কোন না কোন উত্তরদাতাকে ভুলভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। যেমন, 'একজন ব্যক্তি নিয়মিত নামাজ পড়েন কি না', শুধুমাত্র এই একটি প্রশ্ন দিয়েই ধার্মিকতা প্রত্যয়টিকে পরিপূর্ণভাবে পরিমাপ করা যায় না। আরো কিছু সূচক রয়েছে, যেগুলোর অনুশীলন ধার্মিকতাকে অর্থবহ করে তোলে। একজন ব্যক্তি নিয়মিত নামাজ না পড়েও অন্যান্য সূচকের অনুশীলনের ভিত্তিতে অধিকতর ধার্মিক বলে বিবেচিত হতে পারেন। আবার বিপরীতভাবে, একজন ব্যক্তি নিয়মিত নামাজ পড়েও অন্যান্য সূচকের অনুশীলন না করার ফলে ততটা ধার্মিক বলে বিবেচিত নাও হতে পারেন। অর্থাৎ, নিয়মিত নামাজ পড়া একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হলেও ধার্মিক হবার জন্য তা যথেষ্ট নয়। পুরোপুরি ধার্মিক বলে বিবেচিত হতে হলে নিয়মিত নামাজ পড়ার পাশাপাশি একজন ব্যক্তি নিয়মিত পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন কি না, রোজা রাখেন কি না, যাকাত দেন কি না, সত্য কথা বলেন কি না, প্রতিবেশীদের প্রতি সদয় আচরণ করেন কি না, আর্ত-মানবতার সেবা করেন কি না, ইত্যাদি বিষয়গুলোকেও বিবেচনায় আনতে হবে।

মাপনী হলো এক ধরণের যৌগিক পরিমাপ, যা একটি মানের সাথে সম্পর্কিত কতগুলো বক্তব্য পরিমাপের ভিত্তিতে গঠিত হয়।

অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে একটি চলককে প্রতিনিধিত্বকারী বহু-দফার সমন্বয়ে একটি ক্রমসঞ্চিত যৌগিক মাপনী ব্যবহারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, মানুষের মনোভাবকে পরিমাপের জন্য আমরা ক্রমপরম্পরায় সম্পর্কযুক্ত প্রশ্নমালার বিপরীতে একজন ব্যক্তি কতটুকু একমত হন, এ ধরণের বহু দফাসম্পন্ন প্রশ্নমালার মাধ্যমে একটি যৌগিক পরিমাপের হাতিয়ার তৈরি করি, যাকে মাপনী বলা হয়। মাপনীর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দফা এমনভাবে নির্বাচন করা হয়, যেন বিভিন্ন দফার উপর বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। অন্য কথায়, মাপনী হলো এক ধরণের যৌগিক পরিমাপ, যা একটি মানের সাথে সম্পর্কিত কতগুলো বক্তব্য, প্রশ্ন ও উত্তর দফার সমন্বয়ে এবং পরিমাপের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে একটি নিবিড়তা কাঠামোর (intensity structure) ভিত্তিতে গঠিত হয়।

সামাজিক গবেষণার অন্যতম উপযোগী হাতিয়ার হিসাবে মাপনী নির্মাণের ক্ষেত্রে কতগুলো বিষয় মনে রাখা খুব জরুরী। সেগুলো হলো: বক্তব্য, প্রশ্ন ও উত্তর দফার নির্মাণে সাধারণ, স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ভাষা

ব্যবহার করতে হবে; দফাগুলোকে সংক্ষিপ্ত হতে হবে (২০ টি শব্দের বেশী নয়) এবং সেগুলো যেন একটি বিষয়কে প্রতিনিধিত্ব করে; জটিল বাক্য ব্যবহার পরিহার করতে হবে; অতীতকে সংশ্লিষ্ট করে এবং তথ্য সম্বলিত দফাকে এড়াতে হবে; অস্পষ্ট ও অপ্রাসঙ্গিক দফার অন্তর্ভুক্তি বর্জন করতে হবে। এমন কোন দফা ব্যবহার করা যাবে না, যা সকল উত্তরদাতাই গ্রহণ বা বর্জন করতে পারেন। 'সকল', 'প্রায়ই', 'কেউ নয়', 'কখনই নয়', 'একমাত্র', ইত্যাদি শব্দগুলোর ব্যবহার পরিহার করতে হবে এবং উত্তরের দফাগুলোকে পারস্পরিকভাবে স্বতন্ত্র, সামগ্রিক ও একমাত্রিক হতে হবে।

মাপনী কৌশলের প্রকারভেদ (Types of Scaling Techniques)

মাপনী গঠনের মাধ্যমে উচ্চ মাত্রার কার্যকরীকরণ ও জটিল প্রপঞ্চগুলোর পরিমাপ সম্ভব হয়।

পদ্ধতিগত গুরুত্ব ছাড়াও মাপনী গঠনের কতগুলো বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে। মাপনী গঠনের মাধ্যমে উচ্চ মাত্রার কার্যকরীকরণ ও জটিল প্রপঞ্চগুলোর পরিমাপ সম্ভব হয়। এর মাধ্যমে একজন উত্তরদাতাকে ধারাবাহিকতার নিম্ন মাত্রা থেকে উচ্চ মাত্রার অবস্থানে স্থাপন করে। মাপনী গঠনের মাধ্যমে একটি প্রত্যয়ের প্রায় সব বিষয়কে পরিমাপের আওতাভুক্ত করা যায়। মাপনী উচ্চ মাত্রায় সূক্ষ্মতা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে। মাপনী ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন উপাত্তমালার মধ্যে তুলনাকে সহজতর করে। উপাত্তের সংগ্রহ ও বিশ্লেষণকে মাপনী সহজতর করতে সাহায্য করে। কিন্তু এটির নির্মাণ ও পরিসংখ্যানগত পরীক্ষা বেশ কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার বলে সাধারণ গবেষকদের কাছে এগুলোর নির্মাণ ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে, এর ব্যবহার তেমন আগ্রহ সৃষ্টি করে না। তবে, গবেষকগণ অতীতে বেশ কিছু মাপনী কৌশল নির্মাণ করেছেন এবং পরীক্ষা করেছেন, যা অন্যান্য গবেষকরা তাদের গবেষণায় সহজেই ব্যবহার করতে পারেন। এ সকল মাপনী কৌশল পরিমাপের মাত্রা, উদ্দেশ্য ও গঠন প্রণালীর দিক থেকে ভিন্নতা প্রদর্শন করে। সামাজিক গবেষণায়, যে সকল মাপনী কৌশল খুব বেশী ব্যবহৃত হয়, সেগুলো হলো, থার্সটন মাপনী (Thurstone scaling), লাইকার্ট মাপনী (Likert scaling), বোগার্ডাস সামাজিক দূরত্ব মাপনী (Bogardus social distance scaling) ও গাটম্যান মাপনী (Guttman scaling)। এই কৌশলের প্রকরণগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

থার্সটন মাপনী (Thurstone Scaling)

থার্সটন মাপনী কতগুলো দফার সমন্বয়ে গঠিত, যার অবস্থানগত মান নির্ধারিত হয় কিছু বিশেষজ্ঞ বা বিচারকদের দ্বারা।

মাপনী নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথম পথিকৃত পুরুষ হলেন Louis Thurstone। তিনি ১৯২০-এর দশকে কতগুলো মাপনী কৌশল উদ্ভাবন করেন, যা পরবর্তীতে থার্সটন মাপনী নামে পরিচিত হয়েছে। থার্সটন মাপনী কতগুলো দফার সমন্বয়ে গঠিত, যার অবস্থানগত মান নির্ধারিত হয় কিছু বিশেষজ্ঞ বা বিচারকদের দ্বারা। থার্সটন মাপনীকে পার্থক্যমূলক মাপনীও (differential scale) বলা হয়ে থাকে। থার্সটন মাপনীর বিষয় নির্বাচন এবং সেগুলোর প্রতি মান বরাদ্দের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

প্রথমে, গবেষক যে বিষয়ের উপর অনুসন্ধান করছেন, তার সাথে যৌক্তিকভাবে সম্পর্কিত প্রায় একশ বক্তব্য সংগ্রহ করেন। তারপর, এই বক্তব্যগুলোকে বেশ কিছু সংখ্যক (কমপক্ষে ২৫ জন) বিচারককে নিম্ন থেকে উচ্চ মাত্রায় ১১টি ভাগে শ্রেণী বিভক্ত করার জন্য দেয়া হয়। একটি দফা থেকে আরেকটি দফার ব্যাপ্তিটিকে সমান বলে অনুমান করা হয়। প্রত্যেক বিচারক যে বক্তব্যকে গবেষণার বিষয়বস্তুর জন্য সবচেয়ে বেশী অনুকূলে মনে করেন, সেগুলোকে ১ মান বরাদ্দ করেন; যেগুলোকে তিনি পরবর্তী মাত্রায় সর্বোচ্চ অনুকূলে বলে মনে করেন, সেগুলোকে ২ মান বরাদ্দ করেন; এবং যেগুলোকে তিনি বক্তব্যের সবচেয়ে প্রতিকূলে বলে বিবেচনা করেন, সেগুলোকে ১১ মান প্রদান করেন। এই ধারাবাহিকতায় ষষ্ঠতম বা নিরপেক্ষ অবস্থানটি হলো এমন একটি বিন্দু, যাতে বক্তব্যের অনুকূল বা প্রতিকূলতার কোনটিই নেই। তৃতীয় ধাপে, বিচারকদের দ্বারা বরাদ্দকৃত মানের গড় বা মধ্য অবস্থানকে যে কোন দফার মাপনী মান হিসাবে নির্ণয় করা হয়। যে বক্তব্য খুব বেশি ব্যাপক বা বিস্তৃত থাকে, সেগুলোকে অস্পষ্ট বা অপ্রাসঙ্গিক বলে বাদ দেওয়া হয়। সবশেষে, যে বিষয়গুলো মাপনীর একটি প্রান্তিক বিন্দু থেকে অপরটি পর্যন্ত সমানভাবে বিস্তৃত থাকে, সে বিষয়গুলোকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

অতএব, প্রাপ্ত থার্সটন ধরণের মাপনীটি হলো বেশ কিছু ধারাবাহিক বক্তব্যের সমষ্টি এবং কোন বিষয়বস্তুর প্রতি অনুকূল-প্রতিকূল মনোভাবের ধারাবাহিকতার উপর বিচারকদের দ্বারা শ্রেণীবিভক্তির মাধ্যমে প্রতিটি বক্তব্যের অবস্থান নির্ধারিত হয়। এই মাপনী কৌশলটি বেশ ঝামেলাপূর্ণ এবং সময় ও সম্পদের দিক থেকে খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। বিচারকদের দ্বারা বরাদ্দকৃত মাপনী মানগুলো তাদের নিজস্ব মনোভাবের দ্বারাও প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা থাকে। প্রশ্নমালা পূরণ করার সময়, উত্তরদাতা যে বক্তব্যগুলোর সাথে একমত, অথবা যে বিষয়গুলো তাদের অবস্থানের কাছাকাছি, তাদেরকে সেগুলো চিহ্নিত করতে বলা হয়। কিন্তু প্রশ্নমালায় মাপনী মানকে দেখানো হয় না এবং দফাগুলো সাধারণতঃ মাপনী মান অনুসারে সাজানো না থেকে দৈব ক্রমানুসারে বিন্যস্ত থাকে। ফলে, একই মানের দ্বারা বিভিন্ন মনোভাবসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটতে পারে।

লাইকার্ট মাপনী (Likert Scaling)

লাইকার্ট পরিমাপ পদ্ধতি অনেক বেশী নিয়মতান্ত্রিক এবং পরিশোধিত ।

Rensis Likert ১৯৩২ সালে একটি মাপনী কৌশল নির্মাণ করেন, যা থার্সটন মাপনীর চেয়ে বেশী সুবিধাজনক। সংজ্ঞাগত দিক থেকে লাইকার্টের এই পরিমাপ পদ্ধতি অনেক বেশী নিয়মতান্ত্রিক এবং পরিশোধিত মাপনী গঠনের উপায়। এই মাপনীকে সমষ্টিমূলক (summated) মাপনীও বলা হয়। লাইকার্ট মাপনীর এই প্রত্যয়টি একটি প্রশ্ন বিন্যাসের সাথে সম্পর্কিত, যা সাম্প্রতিককালের জরিপ প্রশ্নমালায় প্রায়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রশ্নমালায় উত্তরদাতাকে একটি বক্তব্য দিয়ে নির্দেশ করতে বলা হয় যে, তিনি কি সেই বক্তব্যটির সাথে 'সম্পূর্ণভাবে একমত,' 'একমত,' 'অনিশ্চিত,' 'দ্বিমত পোষণ করেন,' না কি 'সম্পূর্ণভাবে দ্বিমত পোষণ করেন,'। যেমন, একজন গবেষক একটি সরকারের শাসনামলে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর গ্রহণযোগ্যতা পরিমাপ করতে চান। সে ক্ষেত্রে, গবেষক উত্তরদাতার কাছে নিম্নলিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করে তাদের মতামত চাইবেন:

প্রশ্ন: বর্তমান সরকারের গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মসূচী সত্যিকার সামাজিক উন্নয়নকে বেগবান করেছে। আপনি কি এই বক্তব্যের সাথে

☐	☐	☐	☐	☐
(সম্পূর্ণভাবে একমত)	(একমত)	(অনিশ্চিত)	(দ্বিমত পোষণ করেন)	(সম্পূর্ণভাবে দ্বিমত পোষণ করেন)

লাইকার্ট মাপনীর দফাগুলো অস্পষ্টতাকে পরিচ্ছন্নভাবে দূরীভূত করে এবং চলকের একটি উচ্চ মাত্রার যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে।

উত্তরের দফাগুলোর শব্দ বিন্যাস সুবিধা অনুযায়ী পরিবর্তন করে নেওয়া যেতে পারে। যেমন, 'একমত' এর পরিবর্তে 'অনুমোদন করি', 'সম্মত', ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। লাইকার্ট মাপনীর এই বিন্যাসটির বিশেষ গুরুত্বটি হলো যে, এটি উত্তর দফাগুলোর একটি দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট ক্রমসূচক মাত্রা প্রদর্শন করে। যদি উত্তরদাতাদেরকে উত্তরের দফাগুলো পছন্দ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়, তবে হয়তো তারা এমন কিছু উত্তর দেবেন যে, তাতে করে উত্তরদাতাদের মধ্যে বিষয়টি সম্পর্কে মনোভাবের আপেক্ষিক গুরুত্বকে মূল্যায়ন করা কঠিন হয়ে পড়বে। যেমন, লাইকার্ট মাপনীতে উল্লিখিত দফাগুলোর পরিবর্তে উত্তরদাতার পছন্দ করা 'কিছুটা একমত' 'মোটামুটি একমত', 'প্রায় একমত' 'সত্যি সত্যিই একমত', ইত্যাদির মত উত্তর দফাগুলোর ব্যবহার মনোভাবের প্রকৃত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, এক ধরণের দ্ব্যর্থতা ও অস্পষ্টতা তৈরি করবে। লাইকার্ট মাপনীর দফাগুলো এই অস্পষ্টতাকে পরিচ্ছন্নভাবে দূরীভূত করে এবং চলকের একটি উচ্চ মাত্রার যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে। এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, লাইকার্ট দফার উত্তরগুলোর মধ্যে প্রতিটি দফায় একই মাত্রার তীব্রতার কাঠামো রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। এই বৈশিষ্ট্যটিই লাইকার্ট মাপনীকে অন্যান্য মাপনী থেকে অনন্য করে তোলে।

লাইকার্ট বিন্যাসের আরেকটি দিক হলো যে, এটি সূচক গঠনের একটি সোজা সাপ্টা পদ্ধতি। লাইকার্ট পদ্ধতির অন্তর্নিহিত ধারণাটি হলো যে, বিভিন্ন দফার উত্তরগুলোর ভিত্তিতে যে সামগ্রিক মান তৈরি হয়, তা বিবেচ্য চলককে প্রতিফলিত করে এবং মোটামুটিভাবে একটি ভালো পরিমাপ প্রদান করে। লাইকার্ট মাপনীতে, গবেষক উত্তরের দফাগুলোর উপর সমানভাবে মান বরাদ্দ করেন। যে পাঁচটি দফাকে উপরে

লাইকার্ট পদ্ধতির অ
ধারণাটি হলো যে,
উত্তরগুলোর ভিত্তি
সামগ্রিক মান তৈরি
বিবেচ্য চলককে প্র
করে এবং মোটামুটি
ভাল পরিমাপ প্রদান

উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোকে ০ থেকে ৪, বা ১ থেকে ৫ সংখ্যার মান বরাদ্দ করা হয়। তবে মান বরাদ্দের পূর্বে দফাগুলোর দিক নির্দেশটিকে (direction) বিবেচনা করা প্রয়োজন। এর অর্থ হলো যে, যদি একটি দফাকে ধনাত্মকভাবে বিন্যস্ত করা হয় এবং "সম্পূর্ণভাবে একমত" দফার জন্য ৩ মান বরাদ্দ করা হয়, তবে ঋণাত্মকভাবে বিন্যস্ত দফার ক্ষেত্রে "সম্পূর্ণভাবে দ্বিমত পোষণ করেন"-এর জন্যেও ৩ মান বরাদ্দ করতে হবে। এখানে ৩ সংখ্যা মানটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো যে, মনোভাবের দৃষ্টিভঙ্গিগত দিকের পরিপ্রেক্ষিতে মানগুলোকে সঙ্গতিপূর্ণভাবে বরাদ্দ করতে হবে।

লাইকার্ট মাপনীর একটি সমস্যা হলো যে, যদিও কতগুলো নির্দিষ্ট উত্তরের দফার যোগফল সবসময়ই একই মোট মান প্রদান করে, কিন্তু অন্যান্য বহু উত্তরের সমন্বয়েও একই মোট মানের জন্ম হতে পারে। যেমন, পাঁচ দফা মাপনীর মান ১০ হতে পারে, প্রতিটি ভিন্নমত পোষণের (যার মান ২) দফা থেকে, অথবা একটি 'সম্পূর্ণভাবে একমত', একটি 'দ্বিমত' এবং তিনটি সম্পূর্ণভাবে 'দ্বিমত' দফা থেকে।

বোগার্ডাস সামাজিক দূরত্ব মাপনী (Bogardus Social Distance Scaling)

উত্তরদাতা এবং ভিন্ন ধর্ম বা বর্ণগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে সামাজিক নৈকট্য বা দূরত্ব পরিমাপের জন্য একটি মাপনী নির্মিত হয়েছে, যা বোগার্ডাস সামাজিক দূরত্ব মাপনী নামে পরিচিত।

উত্তরদাতা এবং ভিন্ন ধর্ম বা বর্ণগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে সামাজিক নৈকট্য বা দূরত্ব পরিমাপের জন্য একটি মাপনী নির্মিত হয়েছে, যা বোগার্ডাস সামাজিক দূরত্ব মাপনী নামে পরিচিত। ধরা যাক, একজন গবেষক যদি জানতে চান যে, উত্তরদাতারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে কতটুকু মেলামেশা করতে আগ্রহী হতে পারেন, বা দূরত্ব বজায় রাখতে চান, সে ক্ষেত্রে এই মাপনী কৌশল অনুযায়ী, জরিপের সকল উত্তরদাতাকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে:

ক. আপনি কি আপনার দেশে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বাস করতে দিতে ইচ্ছুক?

খ. আপনি কি আপনার লোকসমাজে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বাস করতে দিতে ইচ্ছুক?

গ. আপনি কি আপনার বসবাসের এলাকায় ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বাস করতে দিতে ইচ্ছুক?

ঘ. আপনি কি আপনার পাশের বাড়িতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বাস করতে দিতে ইচ্ছুক?

ঙ. আপনি কি আপনার সন্তানকে একজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে বিয়ে করতে দেবেন?

এই পাঁচটি প্রশ্নের কাঠামো অনুযায়ী, যারা পুরো সংস্কারমুক্ত, তারা প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে বলবেন, 'হ্যাঁ', এবং যারা সংস্কারাচ্ছন্ন, তারা প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে বলবেন, 'না'। এখানে লক্ষণীয় বিষয়টি হলো যে, একটি প্রশ্ন থেকে আরেকটি প্রশ্নের মধ্যে উত্তরদাতার মনোভাবের নিকটত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশ্নগুলোর এই পার্থক্য দফাগুলোর মধ্যে একটি কাঠামোকে নির্দেশ করে। যদি একজন উত্তরদাতা যে কোন একটি সম্পর্ক মেনে নিতে ইচ্ছুক হন, তবে তিনি তালিকার অন্তর্ভুক্ত কম নিকটত্বসম্পন্ন সম্পর্কগুলোকেও মেনে নিতে ইচ্ছুক হবেন। যেমন, যদি একজন উত্তরদাতা তার বসবাসের এলাকায় ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বাস করতে দিতে সম্মত হন, তবে তিনি তাদের তার নিজের লোক-সমাজে ও দেশে বসবাস করতে দিতেও রাজী হবেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে তার প্রতিবেশী, বা আত্মীয় হতে দিতে রাজী হবেন না।

বাস্তবে, এমনটি প্রত্যাশা করা যায় যে, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা ভিন্ন ধর্ম ও বর্ণগোষ্ঠীর মানুষকে দেশের নাগরিগত্ব প্রদানে আপত্তি করবেন না, এবং সবচেয়ে কম সংখ্যক মানুষ তাদের সাথে আন্তঃবিবাহকে মেনে নেবেন। এদিক থেকে, সহ-নাগরিকত্ব হলো সবচেয়ে 'সহজ দফা' এবং আন্তঃ বিবাহ হলো সবচেয়ে 'কঠিন দফা'। অধিকাংশ উত্তরদাতাই কঠিন দফার চেয়ে সহজ দফাকেই গ্রহণ করবেন। কিছু অবশ্যম্ভাবী ব্যতিক্রম ছাড়া, এটি যৌক্তিক যে, একজন উত্তরদাতা যদি মাপনীতে উপস্থাপিত কোন বিশেষ দফাকে গ্রহণ না করেন, তবে তিনি সেই দফার চেয়ে কঠিনতর দফাগুলোকে গ্রহণ করবেন না। বোগার্ডাস সামাজিক দূরত্ব মাপনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যে, এটি তথ্য সংক্ষিপ্তকরণের একটি মিতব্যয়ী ও কার্যকর উপায় হিসাবে কাজ করে। যেমন, একজন উত্তরদাতা ভিন্ন ধর্ম ও বর্ণগোষ্ঠীর মানুষদের সাথে কয়টি সম্পর্ক মেনে নিবেন, তা জানলেই আমরা বলতে পারি যে, কোন সম্পর্কটি গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এভাবে, কোন তথ্য না হারিয়ে একটি সংখ্যার মাধ্যমে পাঁচ বা

ছয়টি জরীপ উত্তর দফাকে নির্ভুলভাবে সংক্ষিপ্ত করে উপস্থাপন করা যায়। এই মাপনী কৌশলকে ক্রমসঞ্চিত মাপনী (cumulative scale) নামেও অভিহিত করা হয়।

গাটম্যান মাপনী (Guttman Scaling)

বোগার্ডাস সামাজিক দূরত্ব মাপনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যে, এটি তথ্য সংক্ষিপ্তকরণের একটি মিতব্যয়ী ও কার্যকর উপায় হিসাবে কাজ করে।

Louis Guttman ১৯৪৪ সালে একটি মাপনী কৌশল উদ্ভাবন করেছেন, যা বর্তমানে গবেষকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। এই পদ্ধতির পেছনে মূলতঃ, ক্রমসঞ্চিত মাপনীর ধারণাটি কাজ করেছে। বোগার্ডাস সামাজিক দূরত্ব মাপনীর মত গাটম্যান মাপনীও সামাজিক দূরত্ব পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয়। বোগার্ডস মাপনী ও থার্সটন মাপনীর মত, এটিও কতগুলো বক্তব্যকে নিম্ন থেকে উচ্চ ক্রমসঞ্চিত সোপানিক আকারে এমনভাবে উপস্থাপন করে যে, যদি একজন উত্তরদাতা একটি বিশেষ বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে সেই ব্যক্তি উল্লিখিত দফার উপরের বক্তব্যগুলোকেও প্রত্যাখ্যান করবেন। আর যদি কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ বক্তব্যকে সমর্থন করেন, তবে তিনি সেই বক্তব্যের নীচের সবগুলো বক্তব্যকে গ্রহণ করবেন। গাটম্যান মাপনী অনুযায়ী, যে সব দফাকে বিবেচনা করা হয়, সেগুলোর মধ্যে কিছু সূচক অন্যগুলোর তুলনায় কঠিনতর হয়ে যাকে। যে সব উত্তরদাতা কঠিন দফাগুলো গ্রহণ করেন, তারা সহজতরগুলোকেও গ্রহণ করেন। যদি পরীক্ষার অধীনস্ত উপাত্তের মধ্যে এমন একটি কাঠামোর রূপ নেয়, তবে আমরা বলতে পারি যে, দফাগুলো একটি গাটম্যান মাপনী গঠন করেছে।

একটি মনোভাবের দফা অন্যটি থেকে অধিকতর কঠিন হিসাবে বিবেচ্য হতে পারে এই অর্থে যে, এটি আরও শক্তিশালী ধনাত্মক মনোভাবসম্পন্ন উত্তরদাতা সমর্থন করবেন। যেমন, কোন উত্তরদাতা, যার ধুমপানের ব্যাপারে মোটামুটি ঋণাত্মক মনোভাব রয়েছে, তিনি হয়তো টেলিভিশনে সিগারেটের বিজ্ঞাপন বন্ধ করার পক্ষে মতামত দিতে পারেন। কিন্তু যার মনোভাব আরও বেশী ঋণাত্মক এবং যিনি জনসাধারণ্যে ধুমপান নিষিদ্ধ করা উচিৎ বলে মনে করেন, তিনি অবশ্যই প্রথম দফাটির সাথেও একমত হবেন। কিন্তু এমন উত্তরদাতা খুব কমই পাওয়া যাবে, যারা একই সাথে জনসাধারণ্যে ধুমপান নিষিদ্ধ করার পক্ষে এবং টেলিভিশনে প্রচারণা চলতে দেবার পক্ষে মতামত দেবেন। যেহেতু এই দু'টি দফার মধ্যে কোন যৌক্তিক সম্পর্ক নেই, সেহেতু এই পরিচ্ছন্ন সম্পর্কটি প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান কি না, সেটি অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণযোগ্য একটি প্রশ্ন। এ ধরণের বহু-দফার ক্রমসঞ্চিত মাপনী গঠন একটি জটিল পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণের ব্যাপার, যা গাটম্যান মাপনীর মাধ্যমে করা সম্ভব।

গাটম্যান মাপনীকে সাধারণভাবে মাপনী বিশ্লেষণ পদ্ধতি বলা হয়। এই কৌশলের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো যে, যে মনোভাব বা বৈশিষ্ট্যকে গবেষণা করা হয়, তা কেবল একমাত্রিক কি না তা নিশ্চিতভাবে নিরূপণ করা।

গাটম্যান মাপনীকে সাধারণভাবে 'মাপনী বিশ্লেষণ' পদ্ধতি বলা হয়। এই কৌশলের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো যে, যে মনোভাব বা বৈশিষ্ট্যকে গবেষণা করা হয়, তা কেবল একমাত্রিক কি না, তা নিশ্চিতভাবে নিরূপণ করা। গাটম্যান প্রক্রিয়ায় একটি বিষয়বস্তুর সমগ্রককে তখনই একমাত্রিক বলে বিবেচনা করা হয়, যখন এটি সকল সম্ভাব্য উত্তর দফাকে ব্যবহার করে একটি নিখুঁত বা প্রায় নিখুঁত ক্রমসঞ্চিত মাপনী উৎপাদন করে, যা নিম্নে প্রদত্ত ছকের মত একটি রূপ গ্রহণ করে।

সারণি ৩.১: গাটম্যান মাপনী-রূপ

মাপনী মান	একমত						একমত নন					
	০	১	২	৩	৪	৫	০	১	২	৩	৪	৫
৫	−	+	+	+	+	+	+	−	−	−	−	−
৪	−	−	+	+	+	+	+	+	−	−	−	−
৩	−	−	−	+	+	+	+	+	+	−	−	−
২	−	−	−	−	+	+	+	+	+	+	−	−
১	−	−	−	−	−	+	+	+	+	+	+	−
০	−	−	−	−	−	−	+	+	+	+	+	+

সারাংশ

বর্তমানে পাঠে মাপনীর বিভিন্ন দিক এবং ধরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণতঃ, গবেষণায় বয়স, আয়, ইত্যাদি ছাড়াও এমন সব চলক রয়েছে, যা উত্তরদাতার মনোভাব পরিমাপের মাধ্যমে আমরা জেনে থাকি। মাপনী কৌশলটি মনোভাব ব্যক্ত করে, এমন সব চলককে পরিমাপের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন রকমের মাপনী কৌশলের পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। যেমন, থার্সাটন মাপনী, লাইকার্ট মাপনী, বোগার্ডাস মাপনী। এ ছাড়াও, কিছু মাপনী কৌশল আছে, যা গবেষণা সমস্যার প্রকারভেদে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উল্লিখিত মাপনি কৌশলগুলো প্রয়োগের পূর্বে যে প্রপঞ্চগুলোকে পরিমাপ করা হবে, সেগুলোকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে গবেষককে গবেষণা পরিচালনা করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন –

১। মাপনী নির্মাণের ক্ষেত্রে পথিকৃত হলেন:

ক. Thurstone
খ. Bogardus
গ. Guttman
ঘ. Rensis Likert।

২। ১৯৩২ সালে সমাজ গবেষণায় একটি স্কেল প্রবর্তিত হয়। স্কেলটির নাম:

ক. থার্সটন স্কেল
খ. বোগার্ডাস স্কেল
গ. গাটম্যান স্কেল
ঘ. লাইকার্ট স্কেল।

৩। গাটম্যান মাপনী তৈরির পেছনে মূলতঃ _____ ধারণাটি কাজ করেছে।

ক. ক্রম সংখ্যার মান
খ. ক্রম সংখ্যার কেন্দ্রবিন্দু
গ. ক্রম সঞ্চিত মাপনী
ঘ. ক্রম বিন্যাসিত মাপনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। থার্সটন মাপনী কী?

২। লাইকার্ট মাপনী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। মাপনী কৌশলের প্রকারভেদগুলো আলোচনা করুন।

২। গ্রাম উন্নয়ন গবেষণায় কোন স্কেলটি যথাযথ ফল দেবে বলে আপনি মনে করেন? যুক্তি প্রদান করুন।